রঙ্গরাগ

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৬২
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
মুদ্রাকর—অজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

আড়াই টাকা

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বসু

পরম সুহৃদ্বরেষু—

—লেখকের অন্যান্য বই—

আমার পৃথিবী (২য় সংস্করণ যন্ত্রস্থ)

বোবা ঢেউ

মধুমতী (২য় সংস্করণ)

রাত ভোর

চন্দন ডাঙার হাট

রাগিনী (২য় সংস্করণ যন্ত্রস্থ)

যৌন-বসন্ত

সংখ্যা ঃ

এমন এক একজন মানুষ আছে, যারা অনেকটা পদ্ম পাঁপড়ীর ওপর এক বিন্দু শিশিরের মত। পৃথিবীর দিনরাতের পিছল গায়ে আলগা হয়ে লেগে আছে যেন। মনে নেই কোন লালসার লালা, যা দিয়ে তার মনটাকে জুড়ে দেয়া যাবে অন্য মনের মহলে। প্রচুর অর্থের তার কাছে কোন অর্থ নেই, অসামান্য সম্মানে মন নেই, রমণীয় রমণীর রূপরাগেও অনুরাগ আসে না তার। এমনি একটি মানুষ বীরেশ।

ছেলেবেলা থেকে কথা বলে কম। ভাবে বেশী। যা ভাল মনে হয়, করে ফেলতে চায় তখনি। বাধা মানবার মানুষ নয়। মনে তার ময়লা জমে না, তাই সংসারের সত্যি রূপটা আয়নার মত দেখতে পায় ও।

যা অন্যায্য, তাকে মানবে না। যা ন্যায়, তাকে মানতেই হবে।—আর এই ন্যায় অন্যায়ের আসল রূপটা ও দেখতে পায় স্বচ্ছ অন্তরের ভাব তরঙ্গের প্রতিবিম্বে।

তাই নিতান্ত ছেলেবেলায়ও বাপ যখন বলেছেন,—উপরি পেলেম আজ সাড়ে পাঁচশ টাকা।

বীরেশ শুধিয়েছে—উপরি কি বাবা ? চুরি ?

বাবা হয়ত হেসে বলেছেন মায়ের দিকে তাকিয়ে,—কেমন চালাক দেখেছ ?

তারপর বলেছেন,—একরকম চুরিই বলা যায়।

বীরেশ তখুনি বলেছে,—তবে ওটা না নিলেই পারতে।

তখন বীরেশের বয়স সাত।

সংসারের সব ঘটনার চুলচেরা বিচার করতে ওর মন যেন সব সময়ই উন্মুখ হয়ে থাকে। কোন এক ঘটনা যদি কোন সময় ওর মনে রেখাপাত করে, ও নীরব হয়ে যায় কয়েকদিনের জন্যে। বসে বসে ভাবে। মীমাংসা খুঁজে বেড়ায় মনের গভীরে।

প্রবেশিকার পথ পার হয়ে কলেজের দরজায় যখন ঢুকলো বীরেশ, তখন স্বদেশী ডাকাতের যুগ। সশস্ত্র বিপ্লবে স্বাধীনতা আনবার স্বপ্ন দেখছে দেশের তরুণরা।

এমনি এক সময়েই এক বন্ধু জুটলো বীরেশের। 'অনুশীলন' নামে এক গোপন দলের পাণ্ডা।

বীরেশের তেজী চরিত্রে মুগ্ধ হোল সে বন্ধু।

বললে,—তোদের মত কিছু মানুষই তো চাই। দেশের বাঁধন ছেঁড়বার শক্তি নিয়েই জন্মেছিস তোরা।

শোনালো অনেক কাহিনী—অনেক অনেক রোমাঞ্চকর অত্যাচারের কথা। দেশের মানুষগুলোকে কুকুরের মত চাবুক মারবার কি অধিকার আছে বিদেশীদের! এমনি সব নিদারুণ প্রশ্ন।

বীরেশ গম্ভীর হয়ে উঠলো দিন দিন।

রাতের পর রাত গঙ্গার ধারে বসে কত কথা শোনালো বন্ধুটি। চোখে জল এলো তার বলতে বলতে জালিয়ানাওয়ালাবাগের নারী হত্যার আর শিশুমেধ যজ্ঞের বৃত্তান্ত। এর প্রতিশোধ কি নেয়া যায় না?

বীরেশ টলে উঠলো।

বললে বন্ধুটি,—আমরা তো জীবন পণ করেছি ভাই দেশকে বাঁচাতে। তুইও আয় না।

হঠাৎ কিছু বলতে পারে না বীরেশ।

দুটি ছোট ভাই, মা, বাবা,—মুখগুলো ভেসে ওঠে মনের ওপর।

বিশেষ করে মায়ের মুখটিই বারবার মনে পড়ে ওর।

বন্ধুটি বলে ওকে ওর দলের কথা। তাদের কিছু কিছু গোপন কাজের ফিরিস্তি,—কিন্তু ভাই জান্ দিয়ে দিতে হবে। কোন মায়া নেই। নিজের জীবনের মায়াও নেই।

ভেবে দেখি ভাই।

সময় নিলো বীরেশ।

তারপর সুগভীর ভাবনায় ডুবে গেল কয়েকদিন। চুলচেরা বিচারের পর ওর মনে এই বাণীই ভেসে এলো—এই পথেই যেতে হবে ওকে। মা আছে, আরও দু'ভাই আছে। ওদের নিয়েই থাক।

দলে এলো বীরেশ।

সুরু হোল কাজ। দিবারাত্র।

মা চোখের জল ফেলে শুধোত,—এত রাত কোথা থাকিস্?

বীরেশ কথা বলত না।

বহু অনুনয়ের পর বলতো হয়ত,—আমার আশা ছেড়ে দাও মা। ধীরেশ, সীতেশ ওদের নিয়ে থাকো।

মায়ের চোখের জল গড়িয়ে পড়ত দরদর করে।

বাবা শুনে গম্ভীর হয়ে যেতেন। পাংশু হয়ে উঠত মুখ। বড় আশা ছিল তাঁর, বীরেশ বড় হয়ে তাঁর পেছনে দাঁড়াবে!

আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ডাকাতি করতে হল বীরেশকে। কতদিন বেড়াতে হোল পালিয়ে। কতবার যেতে হোল বাংলার বাইরে। একবার তো ঠিকই হয়ে গেল বন্ধুটি আর ও চলে যাবে জার্মেণী।

কিন্তু। হোল না। এক ডাকগাড়ী লুঠ করে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফাতে গিয়ে মারা পড়ল বন্ধুটি।

বড় অন্তরংগ বন্ধু তার।

বীরেশ আরও গম্ভীর হয়ে উঠলো। কাজ বাড়িয়ে দিলে দ্বিগুণ।

দিনে রাতে চারটা পাঁচটা কথাও হয়ত বা বলত না। শুধু কাজ।

এ কাজেরও শেষ হলো একদিন।

রাত দেড়টায় বাড়ি ফিরতে গিয়ে এক ট্যাক্সি থেকে নেমে বাড়ির রাস্তার দিকে এগোতে যাবে—ওমনি শব্দ শোনা গেল পুলিশের বাঁশীর।

দৌড়োতে গিয়ে দেখলে চারিদিকে ঘিরে ফেলেছে ওকে পুলিশ।

দারোগা এসে জড়িয়ে ধরতে যাবে ওকে। ও মারলো তার পেটে ঘুষি। দৌড়োল খানিকটা। কিন্তু বরাত। কাপড়ে আটকে পড়ে গেল রাস্তার ওপর।

তিন চারটে ভোজপুরী পুলিশ এসে চেপে ধরলো ওকে।

কোমরে দড়ি বেঁধে হাতকড়া পরান' হোল সাধারণ চোরের মত।

তারপর নিয়ে আসা হোল ওদের বাড়ি।

মা বীরেশের কোমরে দড়ি বাঁধা, কপাল ফাটা দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

বাবার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

ভাই দুটি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল শুধু দাদার দিকে।

বাড়ি খানাতল্লাসী করে কিছু কাগজপত্র নিয়ে, বীরেশকে নিয়ে চলে গেল পুলিশ।

তারপর ? তারপর সুদীর্ঘ ছ' বছর পর ছাড়া পেলো বীরেশ। বাবা মারা গেছেন তখন। মা শয্যাশায়ী।

মেজ ভাই ধীরেশ ক্লাস নাইনে উঠে পড়া ছেড়ে দিয়েছে। এক হোটেল খুলে বসেছে বাবার জমানো কিছু টাকায়। তা না করলে সংসারই বা চলবে কি করে।

বিছানা স্যুটকেশ হাতে ট্যাক্সি থেকে নেমে বীরেশ এসে যখন মায়ের সামনে দাঁড়ালো, মায়ের তখন কথা বলবার শক্তিও লোপ পেয়েছে। দেহের একদিক অবশ হয়ে গেছে একেবারে।

বীরেশ প্রণাম কোরল মাকে।

মা তাকিয়ে রইল শুধু। চোখের কস বেয়ে জল পড়ছে তার।

বীরেশ ধীরে ধীরে এসে বিছানার পাশে বসে চোখ মুছিয়ে দিলো মায়ের।

একখানা হাত তুলে নিল নিজের কোলে।

ধীরেশ এলো ইতিমধ্যে।

—দাদা ! প্রণাম কোরল বীরেশকে।

ভাইয়ের কাছ থেকেই শুনল বীরেশ ছ'বছরের নানা পরিবর্তনের কথা।

—বাবা মারা যাবার পর তো পথেই বসেছিলাম। যা দুচারটে টাকা ছিল তাই নিয়ে হোটেল খুলে বসলুম। তবে তো সংসার চলছে।

আত্মগর্বে একটু হাসলো ধীরেশ। বাবার মৃত্যুর পর সে যে সাড়ে চার হাজার টাকা পেয়েছিলো সে কথাটা চেপে গেল বেমালুম।

বীরেশ শান্ত স্বরে বললে,—বেশ করেছিস্। মাকে কোন ডাক্তার দেখছে ?

—ডাক্তার! তুমি কি যে বলো দাদা! এদিক আসতে ওদিক ফুরোয় ডাক্তার দেখাব কোত্থেকে!

বীরেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো ধীরেশের দিকে। ধীরেশকে সে কিছু কিছু চেনে। ছোটবেলা থেকেই বড় মাছটা তার পাতে না পড়লে মাকে যা নয় তাই বলে বসত। বাবার কাছ থেকে নানা ছুতোয় টাকা নিয়ে নিজের জামা কোরত মাসে একটা করে। কথা বোলত বেশী—সবই প্রায় মিথ্যে আর বাজে কথা।

ধীরশকে চিনলেও ওকে ভাল না বেসে পারত না বীরেশ। ছোট ভাই, একটু অবুঝ। তাহোক। ও না হয় একটু বেশী খায়। খাক না। না হয় একটু জামা কাপড়ে ফিট্‌ফাট্ থাকতে ভালবাসে। তা থাক না।

তবু ধীরেশকে ভালবাসে বীরেশ। তার চেয়েও ভালবাসে ছোট ভাই সীতেশকে।

বড় ভাল মানুষ সীতেশ। সাতে পাঁচে নেই। কথা ভাবনা নেই। নিতান্ত সাধারণভাবে নিজের কাজটি নিজে করে যায়। বড় ভাল ভাইটি।

তেমনি শান্ত স্বরেই বীরেশ বলে,—ডাক্তার একজনকে দেখাতেই হবে। মধু ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয় এখুনী। আর সীতেশ কই ?

ধীরেশের মুখটা বেজার হয়,—কে জানে, বোধহয় কোথায় আড্ডা মারতে বেরিয়েছে। ডাক্তার কাল ডাকলে হোত না!

বীরেশ একটু হেসে বলে,—না ভাই আজই। এখুনী।

বীরেশের কথা অমান্য করবার সাহস নেই ধীরেশের। অগত্যা ওকে যেতে হয়।

কিছুক্ষণ পরই সীতেশ আসে। বীরেশকে দেখে ভারী খুশী।

দাদা কখন এলে ?—প্রণাম করে সীতেশ।

বীরেশ ওকে হাত ধরে ওঠায়,—একটু আগেরে! তুই কোথায় গিয়েছিলি ?

সীতেশ হেসে জবাব দেয়,—এক প্রফেসারের বাড়ি পড়তে।

—কি পড়ছিস্ ? চিঠি লিখিসনি কেন এতদিন ?

—মেজদা বারণ কোরত।

বলেই সীতেশ কথাটা ঘুরিয়ে নেয়,—সে কথা যাক। এবার সেকেণ্ড ইয়ার। তুমিও ত' চিঠি দিতে না?

বীরেশ কথা বলে না।

ধীরেশ সত্যিই বারণ কোরত বীরশকে চিঠি দিতে। বোলত', নিজে ত' গেলেন জেলে। বাবাকে তো' দাদাই মেরেচে। মাকেও মারতে বসেছে। আমাদের পথে বসাচ্ছে। এখন দাদাকে চিঠি না কচু দেবে।

সীতেশ ধীরেশের কথার জবাব দিত না বটে, কিন্তু কথাগুলো ভাল লাগত না। দাদার কি দোষ ভেবে পেত না ও।

এ ছাড়াও ধীরেশ যে ওকে টাকা দিয়ে পড়াচ্ছে,. সংসার চালাচ্ছে এজন্যে বহু কথা বহু সময় শুনতে হোত ওর। শুধু ওর নয় মায়েরও।

এসব কথারও কোন জবাব দিতনা সীতেশ। নিজের পড়াশুনো নিয়ে থাকত দিনরাত। তবু ধীরেশ যখন পরীক্ষার টাকা জমা দেবার সময় বা বই কেনবার সময় ওকে ধমকাত, তখন ও আর সইতে পারত না। গিয়ে বলত মাকে। মা বলত,—ছেড়ে দে বাবা। তবু ত' ও ছিল বলে জাত রক্ষে হোল। তোর টাকা না হয় আমি চেয়ে দোব।

সীতেশ আর কিছু বোলত না। ভেতরে ভেতরে ছেলে পড়াবার চেষ্টায় থাকত।

ক্রমে দু' একটি ছেলে পড়িয়ে যা পেত, তাতে ওর হাত খরচ চলতো। মায়েরও।

ধীরেশ মাকে একটি পয়সা নগদ তুলে দিত না সেটা সীতেশ দেখতেই পেত।

এ সব কথা বীরেশকে বলে লাভ নেই। সীতেশ সব কথাই গোপন করে যায়। তবু বীরেশ বোধহয় কিছু কিছু বুঝতে পারে। বুঝেও চুপ করে থাকে।

ডাক্তার আসে। ওষুধ আসে। ধীরেশ টাকা দিতে আপত্তি করে।

বীরেশ ওকে বুঝিয়ে বলে,—উপায় কি ভাই। এক কাজ করনা, তুই যা পারিস মাস কাবারে আমায় দিয়ে দে। আমি খরচ চালাব।

ধীরেশ দাদার মুখের ওপর কিছু বলতে পারে না। মাসে একশ পঁচিশ টাকা দিতে রাজী হয়। রাজী হবার আর একটি কারণ, বীরেশ যে হোটেলে নিজে বেরুতে চায় নি, এতেই ও খুশী। হোটেল ওর একার। ওখানে অন্য কোন ভাইয়ের উপস্থিতি সহ্য করবে না ও।

বীরেশ ওর মনোভাব বুঝেই কথা বলেছে। যাক। হোটেলটা নিয়ে ও থাক। যদি উন্নতি করতে পারে, করুক না। নিজের ভাই উন্নতি করবে, পর ত' নয়!

তাছাড়া বীরেশের নিজের টাকার কিই বা দরকার!

ডাক্তারের সুচিকিৎসায় মা সম্পূর্ণ ভাল হয়ে না উঠলেও কথা বলতে পারল। উঠে বসতে পারলো।

বীরেশ মনে মনে ভারি সুখী।

সীতেশও।

ধীরেশের মুখে হাসি ফুটলো না।

দিন কিছু কাটলো। বীরেশ স্বদেশীর দল প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। দলের সব গ্রেপ্তার হয়ে ছত্রভংগ হয়ে পড়েছে। তাছাড়া মানুষের মন বদলেছে। সবাই আজ বলতে শুরু করেছে,—সন্ত্রাসবাদে স্বাধীনতা আসবে না।

তবে কি এতগুলো কিশোর একদিন ভুল করে এসেছে! কিছুই কি দাম নেই তাদের কাজের? চোখের সামনে দেখেছে শুধু মাত্র দেশকে ভালবেসে জীবন মৃত্যু তুচ্ছ করেছে কত কিশোর বান্ধব তার। সবই কি ভুল—সব বৃথা?

মন সায় দেয় না।

তবু বলতে পারে না কিছু। মানুষের মনে আর স্থান নেই তাদের। শুধু চুপ করে থাকা। ও জানে ওদের কেউ কেউ গেছে কংগ্রেসে, কেউ বা বামপন্থী দলে। যারা মন পাল্টাতে পারেনি, তারাই আজ আছে চুপ করে। যেন মরার মত। বীরেশ আজ তাদেরই একজন।

মায়ের ওপর ওসব প্রাণ ঢেলে দেয় তাই। মায়ের সেবা, মায়ের সুখ, এই ওর এখন একমাত্র চিন্তা। কিন্তু মাও বুঝি বেঁকে বসে। বলে বসে একদিন,

—একটা কথা রাখবি?

—রাখব। বলে বীরেশ।

—মাধব ভট্‌চাযের মেয়েকে তোর বিয়ে করতে হবে। ওরা আমায় এসে বড় ধরেছে। পরশু এসেছিলো বলি নি তোকে।

বীরেশ আর একটা কথাও বলতে পারে না।

দিন দুয়েক গভীর চিন্তায় ডুবে যায় বীরেশ।

সেদিন মায়ের কাছে এসে বলে,—এ কথাটা ফিরিয়ে নাও না মা।

মা শুনতে চায় না। বলে,—তোকে সংসারী দেখে মরতে পারলে শান্তি পেতুম বাবা।

—কিন্তু একটা চাকরি-বাকরি কিছু না করে—

মা তবুও শোনে না,—আমার আশীর্বাদে চাকরি তুই পাবি। ওরা বড় ধরেছে বাবা! অমত করিসনে।

বীরেশের অমত করবার সাধ্য নেই আর।

মা ভারী খুশী। মেয়ের প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে।

সীতেশ আর ধীরেশ মেয়ে দেখতে যায়।

ফিরে এসে ধীরেশ রেগে আগুন,—তোমার কি চোখও নেই মা। ও মেয়ে যে কয়লাকুঠি থেকে উঠে এসেছে।

সীতেশ একটু ধীরস্বরে বলে,—তোমায় মেয়ে দেখাতে নিয়ে এলো, ওই মেয়ে কি বলে পছন্দ করলে?

মা মধুর হাসে,—তা হোক। একটু ময়লা বই ত নয়। মেয়েটি বড় ভালো।

ধীরেশ রেগে চলে যায়,—যা খুশি কর।

সীতেশ বলে,—আরও মেয়ে দেখা যাক না!

মা কিছুতেই শোনে না,—আমায় বড় ধরেছে! তোরা অমত করিসনে।

অবশেষে ময়লা মেয়ে সুবর্ণলতার সঙ্গে বীরেশের বিয়ে হয়ে যায়।

এ সংসারে সুবর্ণলতার এই প্রথম পদক্ষেপ।

একে ময়লা তার ওপর গরীব। সংসারে এর চেয়ে হতভাগা মেয়ে আর কই। বীরেশ নীরবে বিয়ে করে আসে।

বাসরে সুবর্ণলতা কাঁদে।

বীরেশ শুয়ে পড়ে একপাশে নীরবে।

কিন্তু কান্নার শব্দে ওকে উঠতে হয়, বলতে হয়,—কাঁদছো? কেন?

সুবর্ণলতার বাসর বড় বেদনার—বড় ভয়ের।

কি হোল? বাইরে যাবে? এ ছাড়া আর বীরেশ কীই বা বলতে পারে?

তবু সাড়া মেলে না।

বীরেশ একটু বিরক্ত হয়েই বলে,—কি চাও?

সুবর্ণলতা ঝুপ্ করে বীরেশের পা দুটোর ওপর পড়ে।

বীরেশ ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কিছু বা অবাকও হয়।

—পা ছাড়ো। একি ছি, ছি!

সুবর্ণলতার কান্নার ভেতর ফিস্‌ফিসানী শোনা যায়,—আমাকে ক্ষমা করুন।

—ক্ষমা কিসের?

—আমাকে বিয়ে করে আপনি সুখী হন নি।

—কি করে জানলে?

সুবর্ণলতা নীরব।

বীরেশ ওর পিঠে হাত রাখে,—পা ছাড়ো। ওঠো।

সুবর্ণলতার ফোঁপানী শোনা যায়,—আমি জানি আমাকে পছন্দ হয় নি। আমি কালো, ভালো দেখতে নয়। আপনার যুগ্যি নই।

বীরেশ ম্লান হাসে—অপছন্দও হয় নি। ওঠো।

নিজে হাতে করে ওঠায় ওকে বীরেশ। কালো মুখখানার দিকে তাকায়। ডাগর চোখদুটো ওর ভয় ভয় ভরা।

মায়া হয় যেন একটু।

বীরেশ স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলে,—আমার মা ভাইদের ভালবেসো তারা সুখী হলে আমি তোমাকে খুবই পছন্দ কোরব।

সুবর্ণলতা আর কথা বলে না।

বীরেশ একটা হাঁই তুলে শুয়ে পড়ে। বেশী কথা বলা ওর স্বভাব নয়।

সুবর্ণলতা চোখে জল নিয়েই কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

এমনি এক নীরস বাসর রাত থেকেই সুবর্ণলতার বধূ জীবনের সুরু। বীরেশেরও নারী সঙ্গ সুরু।

সময় আরও কাটে। প্রায় দু' বছর। ইতিমধ্যে অনেক চেষ্টার পর এক বান্ধবের কৃপায় একটি চাকরি যোগাড় করতে পেরেছে বীরেশ। মাইনে সামান্য। কাজ বেশী। তবু উপায়ই বা কি! কিছু টাকার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। ধীরেশ যদিও টাকা মাসে মাসে দাদার হাতেই তুলে দেয়, তবু একআধ দিন বলেও ফেলে, আমি একা খেটে মরব। আর সবাই বসে বসে খাবেন! কথাটা অবশ্য বলে মাকে উদ্দেশ্য করে। সুবর্ণলতার প্রাণে লাগে।

অনেক সঙ্কোচের পর ও বলে বীরেশকে সেদিন রাত্রে,—মেজ ঠাকুরপো কি বলেছিলো জানো!

—কি!

—বলছিলো, আমি একা খাটব কেন! সত্যিই বাপু, ও একা খেটে আর পারেও না।

বীরেশের মুখটা শুকিয়ে যায়। তবু হাসবার চেষ্টা করেই বলে—ও একটা আস্ত পাগল। তুমি কিছু বলো নি ত'?

—না, আমি কি বোলব?—সুবর্ণর মুখটা ম্লান হয়ে উঠলেও হেসেই বলে কথাগুলো। ওর প্রাণে সাধ হয় বীরেশ চাকরি করুক। দুটো ব্লাউজ কিনে দিক, কিনে দিক একটা আলতা বা হিমানী। কিন্তু মুখে বলে না কিছু। বীরেশকে কিছুটা চিনেছে ও। বীরেশকে স্বামী পেয়ে সুবর্ণ নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করে। আলতা হিমানী তার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ।

সুবর্ণ বলে একটু থেমে,—একটা কথা বোলব রাগ করবে না ত'?

—বলো।

খুব আস্তে বলে সুবর্ণ ভয়ে ভয়ে—একটা চাকরির চেষ্টা কর না কেন?

বীরেশ একটু চুপ করে থেকে সুবর্ণর দিকে তাকিয়ে হাসে, যেন সুবর্ণর মনোভাবটা তার অজানা নয়। বলে—পাচ্ছি কই?

সুবর্ণ ভেবেছিলো উত্তর কিছু পাবে না বীরেশের কাছ থেকে।

উত্তর পেয়ে একটু অবাক হয়। খুশীও।

বলে না আর কিছু।

এর পরই বীরেশের ঘোরাঘুরিতে এক ধনী বন্ধুর বাবার কারবারে চাকরি পায় বীরেশ। মাইনে পঁচিশ। চাকরি ত!

মায়ের অসুখ বাড়ে আবার! এবার মৃত্যু রোগ।

শরীর সব ফুলে যায়। অবশ হয়ে যায় সর্বশরীর।

স্বর্ণ তখন অন্তঃসত্ত্বা।

তবু কি সেবাটাই করে স্বর্ণ। নিতান্ত বদমেজাজী ধীরেশও বিস্মিত হয়ে ওঠে। বৌদির নিন্দে করবার আর ভাষা নেই কোনও।

এরই ভেতর ধীরেশের জন্যে আলাদা করে একটু ভাল মাছ রেঁধে দেয়। সীতেশের বই খাতা গুছিয়ে রাখে। পরীক্ষার আগে একটু করে ঘি খেতে দেয়। বীরেশের গেঞ্জী কাচা। সীতেশের জামার বোতাম লাগান। সব করে যায় স্বর্ণ। শুধু বেশী নজর দেয় না বীরেশের ওপর।

ধীরেশ শুধু অবাকই হয় না। একখানা শাড়ি, কি একটা চিরুণী নিজে থেকেই এনে দেয় বৌদিকে।

—এই শাড়িখানা পরো।

স্বর্ণ হাত পেতে নেয়, এক গাল হেসে বলে—কি দরকার ছিল ঠাকুরপো। হাতে তোমার টাকা নেই।

ধীরেশ খুশীর ওপর খুশী।—টাকা নেই ঠিকই। তবু মনে বড় ইচ্ছে হোল একখানা শাড়ি দেই তোমাকে।

স্বর্ণ ঠাট্টা করে,—শাড়ির লোক আসবে শিগ্‌গিরই।

ধীরেশ হাসে—ফুল চন্দন থাকলে মুখে ছুঁড়ে দিতাম বৌদি!

স্বর্ণ চলে যায়।

সীতেশও হয়ত আট আনার জিলিপী নিয়ে আসে ওর ছেলে পড়ানোর টাকা থেকে, —বৌদি, কই?

স্বর্ণ ছুটে আসে,—আমায় বোলচ ছোট্‌ঠাকুরপো?

—হ্যাঁ, এই নাও জিলিপী এনিচি।

সুবর্ণ খুব হাসতে থাকে,—কি অন্যায় বলোত ছোট্‌ঠাকুরপো, এতগুলো জিলিপী!

সীতেশ বলে,—তুমি ত' ভালোবাসো খেতে।

—ভালবাসলেই কি মেয়ে মানুষের অত জিভ ভালো! তাছাড়া পয়সাইবা কোথা পাবে!

সীতেশ খুব খুশী,—কিই বা খাও, দেখছি ত'। তোমার জিভটা কি পাথর দিয়ে তৈরী?

—কেন বলো ত'?

—নইলে দুটো ডাঁটা দিয়ে এক থালা ভাত কি করে খাও শুনি?

সুবর্ণ ভারী লজ্জায় পড়ে যায়,—কে বললে দুটো ডাঁটা। মিছে কথা বলা হচ্ছে আজকাল! আর লুকিয়ে আমার খাওয়া দেখো নিশ্চয়ই! কাল থেকে দেখলে আর খাবই না। যার খাওয়া দেখবে—সে এলো বলে!

সীতেশ লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে,—সুবর্ণ কি যে বলো!

সুবর্ণ ওর হাতে দুখানা জিলিপী দেয়।—নাও তুমি দুখানা খাও। দুখানা মেজঠাকুরপো, দু খানা তোমার দাদা, এক খানা পাশের বাড়ির মেয়েটা।

সীতেশ ওর কথার রেশ টেনে বলে,—একখানা সকাল বেলার ভিখারীটা, দুখানা বিকেল বেলার বোষ্টমীটা—ব্যস্! তবে ত' খুব খেলে! আমার সামনে খাও।

সুবর্ণ খিল খিল করে হাসে,—সে আমি কিছুতেই পারব না।

বলে পালায়।

শাশুড়ীর সেবায় প্রাণপাত করে সুবর্ণ। বীরেশ সব লক্ষ্য করে। মনে মনে খুশী হলেও মুখে কিছু বলে না। মায়ের কাছে গিয়ে বসে অপিস থেকে এসে,—কেমন আছো মা?

মা কথা বলতে পারে না ভাল করে, জানায়, ভাল নেই।

আশীর্বাদ করে বীরেশকে।

সুবর্ণ আসে গরম জল নিয়ে ওষুধ খাওয়াতে।

নিদারুণ বেদনায় হাসি পেত স্বর্ণর। হেসেই বলত,—থাক, ওটা থাকলে ছোট ঠাকুরপোর দুটো গেঞ্জি হবে, ওর গেঞ্জিত ছিঁড়ে গেছে।

বীরেশ খুশী হোত,—ঠিক বলেছ। তোমার ভারি বুদ্ধি স্বর্ণ।

স্বর্ণ বেদনা চাপত। বীরেশ তার বেদনার আভাসমাত্রও বুঝত না, বুঝতে চেষ্টাও কোরত না।

বাঁচবার ইচ্ছে স্বর্ণর ছিল না। তবু বেঁচে গেল। ছেলে কোলে নিয়ে আসতে হোল আবার। নিয়ে এলো সীতেশ। ধীরেশ হাসপাতালে দুদিন গিয়েছিলো কিছু ফল হাতে নিয়ে। বীরেশ একদিনও যায় নি।

না বলে পারল না স্বর্ণ,—একদিন ত' দেখতেও গেলে না?

বীরেশ গম্ভীর স্বরেই বললো,—সীতেশ ত' রোজই যেত, আমার যাবার আর কি দরকার।

স্বর্ণ জানত বীরেশকে বোঝান যাবে না কিছুতেই সে একবার গেলে স্বর্ণর যেমন লাগে, সীতেশ এক লক্ষ বার গেলেও তেমন লাগে না।

স্বর্ণ চুপ করে যায়। বলে,—ছেলে কেমন হয়েছে।

বীরেশ একবার তাকায় বাচ্চাটার দিকে,—বেশত, ভালোই।

স্বর্ণ আর একটা কথাও বলে না।

আরও বছর দুয়েক এই ভাবেই কাটে। উদয়াস্ত হাড় ভাঙা খাটুনীতে সেবার স্বর্ণ অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়ে। ধীরেশের হোটেলের উন্নতি হয়েছে আরও। সীতেশ এম, এ, পড়ছে। সীতেশ ছেলে পড়িয়ে রোজগার করে আরও বেশী। যা পায় ভাইপোর জন্যেই খরচ হয়ে যায়। বৌদির জন্যেও। ধীরেশ ভাইদের জন্যেই সর্বদা ব্যস্ত। স্বর্ণ বা ছেলের দিকে নজর দেবার সময় কই তার। অপিসের খাটুনীতে বীরেশের শরীরও কিছুটা কাহিল হয়। তাছাড়া নিজের জীবনের সব চেয়ে ভাল সময়টাই কাটিয়েছে জেলে। কেন যে কাটিয়েছে তা' যেন আজ আর বুঝে উঠতে পারে না। মনটাও যেন কিছুটা ভেঙে পড়তে চায় বীরেশের। নিজের ওপর ভরসা আর বিশেষ পায় না। সীতেশের ওপর ওর টানটা তাই সবচেয়ে বেশী। ও যেন জীবনকে বৃথা নষ্ট না করে। ও যেন বড় হয়—আরও বড়। খুব বড়। স্বর্ণর অসুস্থতায় ও

যতখানি না ব্যস্ত হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যস্ত হয় সীতেশের শরীর খারাপ দেখলে বা ধীরেশের খাওয়ার কষ্ট হলে।

সীতেশ কিন্তু বৌদির কষ্ট সইতে পারে না। একদিন বলে দাদাকে,—আমার এক বন্ধুর মাস্‌তুতো বোন—দেখতে খুব ভাল,—তারা বলছিলো মেজদা'র সঙ্গে বিয়ের কথা।

বীরেশ মুখ তোলে। একটু ভেবে বলে,—ধীরেশ কি এখন বিয়ে করবে?

সীতেশের কণ্ঠে একটু দৃঢ়তা প্রকাশ পায়,—তাকে করতে হবে। বৌদি ত' খাটতে খাটতে মরতে বসেচে। একা পেরে ওঠে না আর।

বীরেশ সীতেশের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে,—বেশ ত'। ধীরেশকে বলি। ওর মত ছাড়া কিছু হতে পারে না।

বীরেশ কথাটা ধীরেশের কাছে পাড়ে। ধীরেশ অনুগত ভাইয়ের মত বলে,—তোমার যা ইচ্ছে, তাই করো।

বীরেশ বোঝে, বলে,—মেয়ে দেখে আয় একদিন। তোর পছন্দ হলে তবেই কাজ হবে।

ধীরেশ মেয়ে দেখে আসে। পরমাসুন্দরী। রঙ দুধে আলতায়। মুখশ্রী লাবণ্য ভরা। শুধু একটু খাট। ধীরেশ খুব খুশী। এ মেয়ে কি তার বরাতে শেষ পর্যন্ত জুটবে?

কথা পাকা হয়ে যায়। বিয়েও হয়ে যায়। কালো সুবর্ণ রুগ্না হয়ে আরও কুশ্রী হয়ে উঠেছে। হেসে বলে নোতুন বউকে,—দেখো ভাই। কুচ্ছিত বলে দিদিকে ঘেন্না কোর না।

নোতুন বউ এসে হাত ধরে, বলে, অমন কথা বলবেন না।

সুবর্ণ এ বিয়েতে খুশী। আবার খুশী নয়। জা এলে তার কাজ অনেকটা লাঘব হবে। তার দায়িত্ব অনেকখানি কমে যাবে। কিন্তু দায়িত্ব কমবে ভাবতেই তার ভালো লাগে না। দুটি দেওরের পুরো দায়িত্ব বয়ে তার কষ্টও যেমন হয়েছে আনন্দ হয়েছে কতখানি। দেওররা যা কিছুই আনুক না কেন এনেই বলেছে, বৌদি এটা এনেছি, ধরো।

এখন ত' তা বলবে না। এখন একজন ভালবাসবার মানুষ এলো।

তবু ধীরেশ কি চিরকালই বিয়ে না করে থাকবে? বিয়ে করেছে ভালোই করেছে। দু' চারটে কথা বলেই টের পেলো সুবর্ণ মেয়েটি ভাগে চোখে মুখে কথা বলে না। বুদ্ধির দীপ্তিতে ফেটে পড়ে না। কিছুটা ভালোমানুষ যেন।

একে সংসারে ঠিক মতো চালাবার ভার সুবর্ণর। বিশেষ

বীরেশও এই কথাই বললে—বৌমাকে নিজের ছোট বোনের কাজের আর যেন কোন অসুবিধে না হয় নজর রেখো।

সুবর্ণ হাসে—এ কথা আর তোমার শেখাতে হবে না।

ধীরেশ যেন নিজের ভাগ্যকেই বিশ্বাস করতে পারে ফড় করে মানুষ। হোটেল চালিয়ে খায়। তার বরাতে এমন স্ত্রী। বলতে হবে।

ফুলশয্যার রাত্রে ধীরেশ বলেই বসে—আমি তোমার যোগ্য নই।

ওমা সে কি কথা! নোতুন বউ লজ্জা পায় মনে মনে। খুশীও হয় খুব।

ধীরেশ খুব নরম করে শুধোয়—তোমার ডাক নাম কি?

—মাধুরী বলেই ডাকে সবাই।

—ফাইন্ নাম ত'। ধীরেশ আহ্লাদে গলে পড়ে।

ধীরেশ কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারে না।

মাধুরী বসে থাকে তেমনি। বিছানা থেকে একটা ফুল তুলে তার পাঁপড়ী ছিঁড়তে থাকে।

ধীরেশ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে খপ করে ওর একখানা হাত ধরতে যায়।

মাধুরী সরে যায়।

—কাছে আসবে না?

মাধুরী নীরব।

ধীরেশ সাধে—এসো, কাছে এসো।

ধীরেশ কী করবে ভেবে না পেয়ে উঠে দাঁড়ায়।

—বেশ তবে আমি চলে যাই।

দোরের কাছে যেতে মাধুরী ডাকে—শুনুন।

ধীরেশ এক গাল হেসে ফেলে—খুব বোকা-বোকা হাসি।
খার কাছে এসে মাধুরীর হাত ধরে। এবার আর মাধুরী বাধা দেয় না।
মাধুরীর নরম ফরসা হাতখানা ধরে শিউরে উঠে ধীরেশ। বুকের ভেতরটা
আমার ন করতে থাকে।
মেজদা'র কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—এখানে তোমার কোন ভয় নেই।
ধীরেশ মার কি! মাধুরীর ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা যায়।
সীতেশেরকটু ধীর ভাবে বলতে চায়—না, মানে কোন অসুবিধে হলে
ত' খাটতে খা। বৌদি-দাদা সবাই আমাকে ভয় করে চলে, মানে বলতে
ধীরেশ সাঁকাতেই ত' সংসার চলে!
বলি। ওর ম' অলেয্য কথা বললে আমায় বলবে, দুটো দাবড়ানী দিয়ে
দিলেই রেশ া
মাধুরী পুলকিত হলেও মুখে বলে—দিদি ত' খুব ভালো।
ধীরেশ ওর কথার প্রতিধ্বনি করে—হ্যাঁ, বৌদি আমার খুবই ভালো.
তবু বলা ত যায় না। দেখতে ত' ঝোড়ো কাকের মতো, তোমার রূপ দেখে
যদি হিংসে হয়!
মাধুরী কথা বলে না।
ধীরেশ গোঁ ভরে বলতে থাকে—বলা যায় না। হিংসে সবারই
হবে। দাদারও। কেউ ত' আর এত সুন্দর বউ পায় নি। জ্বলে
মরবে সব।
মাধুরী আর একখানা হাত ধীরেশের কোলের ওপর রাখে।
পাশে শুয়ে পড়ে।
একটু পড়েই ঘুমিয়ে পড়ে মাধুরী। নাক ডাকতে থাকে। গায়ে গতরে
একটু নরম ভারী দেহ মাধুরীর। ঘুমোলে নাক ডাকাটা কিছু আশ্চর্য নয়।
মুখটাও একটু হাঁ হয়ে যায় ঘুমের ভেতর।
ধীরেশের কিন্তু খারাপ লাগে না।
নাক ডাকাটাও যেন সুরের মত মনে হয়।
কিছুদিন কাটে। প্রথম প্রথম ধীরেশ একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলে

সুবর্ণকে জড়িয়ে ধরে মা। মাথাটায় ওর হাত বোলায়। প্রাণভরে ...াঁদ করে।

...ীরেশ মনে মনে খুব বেশী খুশী হলেও তার মুখ দেখে বোঝবার ...পায় নেই।

মাসছয়েকের অতিরিক্ত পরিশ্রমে সুবর্ণও একটু কাহিল হয়ে পড়ে। বিশেষ ...রে এ অবস্থায় ওর শরীরটা সমর্থ থাকা দরকার, কিন্তু থাকে কই! কাজের ...াপ যেন ওর হাড়ের ওপর চেপে বসে।

বীরেশ কিন্তু দেখেও একটা কথা বলে না।

একদিন রাত্রে সুবর্ণ বলে,—আচ্ছা, মাঝে মাঝে বুকটা ধড়ফড় করে ...কন বলোত?

—ও কিছু নয়।—বলে বীরেশ পাশ ফিরে শোয়।

...ীতেশের কিন্তু নজর এড়ায় না।

লুকিয়ে এক শিশি ঘি এনে বলে,—বৌদি, রোজ একটু করে ঘি ...খেয়ো। শরীরের যা হাল দেখছি!

সুবর্ণর হাসি আর থামে না,—তুমি এমন পাগল ঠাকুরপো। আমার মত ...তভাগী কি মরে! তাছাড়া ঘি আমার পেটে সইবে না।

সীতেশ তবু ছাড়ে না।

অগত্যা সুবর্ণ রাজী হয় এক সর্তে,—তুমিও কলেজে যাবার সময় ভাতের ...জে একটু করে ঘি খাবে বলো, তবে আমি খাব।

সীতেশকেও রাজী হতে হয়।

অবশেষে বীরেশের মা মারা যায়। মরবার আগে বীরেশের হাত দুটো ...য়ে বুকের ওপর চেপে ধরে। বীরেশের কাছে সমস্ত দুনিয়াটা শূন্য হয় ...ন। পৃথিবীটা যেন ওর কাছে পূর্ণ করে রেখেছিলো মা। এখন মনে হয় ...োথাও কিছু নেই। কোন অবলম্বন নেই। বীরেশের পৃথিবী অর্থহীন হয়ে যায়।

তবু চিরচিন্তাশীল বীরেশ কয়েকদিন কারো সঙ্গে কোন কথা বলে না। শুধু শুধুই ভাবে। মনে হয় এক একবার চলে যাবে কোথায় কোন হিমালয়

পাদদেশে অথবা কোন গোপন গুহায়। কিন্তু ভাইদুটোর অসহায় মুখদুটো ভেসে ওঠে মনের গভীরে—বিশেষ করে সীতেশের। ওরা যে দাদার ওপর নির্ভর করে আছে। এখনও ত' তেমন বয়েস হয় নি।

নিজের বন্ধন নিজের মনেই সৃষ্টি করে বীরেশ। সুবর্ণর কথাও যে মনে না হয় তা নয়। ওর আর কেইবা আছে?

দিনের পর দিন চিন্তার ফাঁকে সংসারের শূন্য গহ্বরগুলো যেন আবার ভরে ওঠে। আবার বীরেশ ওদের নিয়েই পূর্ণ হয়ে ওঠে নিজেরই ভেতরে নিজের অজ্ঞাতে। নিজেকে অতখানি চুলচেরা বিশ্লেষণ করে আর পেরে ওঠে না ও।

দিন কাটে। মাস কাটে। সুবর্ণর ছেলেও একটি হয় শেষ অবধি। হাঁসপাতালে যেতে হয়েছিলো সুবর্ণকে। রক্তহীনতার দরুন কিছুটা জীবন আশংকাও ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও বেঁচে যায় নিতান্ত ভাগ্যে অথবা দুর্ভাগ্যে। বাঁচতে সুবর্ণ চায় নি। স্বামী তার মহৎ—বিরাট। কিন্তু সাধারণ স্বামী নয়। সুবর্ণ সংসারে আর পাঁচটা মেয়ের মত একটি অতি সাধারণ স্বামীই চেয়েছিলো। কিন্তু পেলো না। বীরেশের নির্লিপ্ত মনকে কিছুতেই সুবর্ণ বশে আনতে পারে না। এক একটি পায়রা যেমন মাদী পায়রা ঠোঁট চেপে ধরলে ঠোঁট ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়। বীরেশ যেন সেই জাতের।

সুবর্ণ নিতান্তই সাধারণ মেয়ের মত চেয়েছিলো যে বীরেশ ধীরে ধীরে ভালবাসবে সুবর্ণকে, প্রাণ দিয়ে মন দিয়ে। সুবর্ণর শরীর খারাপ হলে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। সুবর্ণকে নিয়ে তার কৌতূহলের অন্ত থাকবে না। সুবর্ণর সুখের জন্যে নিজে তো কষ্ট করবেই প্রয়োজন হলে—হ্যাঁ, প্রয়োজন হলে ভাইদেরও ত্যাগ করবে। সুবর্ণ ত' চেয়েছিলো এই সবই। চাওয়া কিছু অন্যায় নয়। কোন মেয়েই বা না চায়!

বীরেশ হোল উলটো, তার অবহেলা আর নীরব নিস্পৃহ ভাব সইতে পারত সুবর্ণ। বীরেশ মাঝে মাঝে সুবর্ণকে দয়া করে যখন দুটো টাকা দিতে আসত।—সকালে বরং দু পয়সা করে মুড়ি কিনে খেয়ো।

সুবর্ণর মাথার তালুটা জলে যেত তখন।

সবাই সব কাজই করে। তবু মাধুরী জোর করে দু' একটা কাজ করতে যায়। সেদিন মাছ কুটতে কুটতে হাতে একটু কাঁটা ফুটে যায় মাধুরীর।

ধীরেশ লাফাতে শুরু করে—সর্বনাশ করেচে। সেপ্‌টিক-মেপ্‌টিক হলে কি হবে। তোমাদের কোন আক্কেল নেই বৌদি। ও কি লাইফে মাছ কুটেচে!

বীরেশ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।—কি হোল রে!

—দেখ কাণ্ড। মাছের কাঁটা ফুটে মানে— একেবারে ইয়ে হয়ে—

বীরেশ দেখে গম্ভীর স্বরেই বলে—ও কিছু নয়। একটু চুন দিয়ে দিও বৌমা।

বলে চলে যায়।

সীতেশও গোলমাল শুনে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলো। ব্যাপার দেখে মুচকী হেসে বলে—হাত দুখানা কেটে আলমারীতে তুলে রেখো মেজ বৌদি, বাইরে হাওয়া লেগে ময়লা হয়ে যেতে পারে ত'!

মাধুরী লজ্জায় রাঙা হয়ে তাকায় সীতেশের দিকে।

সীতেশ আর দাঁড়ায় না।

ধীরেশ নিতান্ত বোকা হলেও সীতেশের খোঁচাটুকু খেয়ে আর কথা বলে না। চলে যায়।

মাধুরী মাছ কুটে সীতেশের ঘরে যায়।

হেসে বলে—বেশ বিঁধে কথা বলতে শিখেছ ত' ঠাকুর পো। আমি কি বলেছি আমার হাত ক্ষয়ে যাবে।

সীতেশ হাসে—না তুমি বলবে কেন। মেজ দাকে দিয়ে বলাবে।

মাধুরী হেসে ফেলে—আমি বলিয়েচি! মিছে কথা বললে ঝগড়া হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি।

সীতেশও হাসে। মেজ বৌদি মানুষটা ভালো। মেজদার মতো নয় অন্তত। বলে—বেশ ঝগড়া করার চেয়ে একটা কাজ করে দাও না আমার।

—কি?

—চায়ের একটু গরম জল চড়িয়ে দাও।

মাধুরী সীতেশের চেয়ারের হাতলে বসে পড়ে,—পারব না।

—কেন ?

—হাতে ফোস্কা পড়বে।—বলেই হেসে ফেলে মাধুরী।

সীতেশও খুব হাসতে থাকে।

দিন কাটে। মাস কাটে। মাধুরী এমনিতে খুব চালাক না হলেও এটুকু সে বুদ্ধি করে স্থির করে ফেলে যে সব ভার দিদির ওপর ছেড়ে দিতে পারলে সে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে বসে কাটাতে পারবে। ও ঘুমোয় একটু বেশী। তাছাড়া কাজ করতেও ভাল লাগে না ওর। ওর আলস্য কারো চোখে পড়বে না দিদির অনুগতা হয়ে থাকতে পারলে।

হয়ত বা তাই প্রথম থেকেই ও বলে,—আমি কিছু জানি না, দিদি সব তুমি জানো।

সুবর্ণ হয়ত রাঁধতে রাঁধতে খুশী হয়ে বলে,—তা বলে মাছটাও ওদের দিতে পারবি না!

মাধুরী বলে,—কি জানি বাবা, কাকে ক'খানা দিতে হবে!

—বললাম ত' মেজ ঠাকুরপো চারখানা আর ওরা দু' ভাই দুখানা করে।

—তুমি দিয়ে এসো।

—জ্বালালি আমায়। তবে তরকারীটা নাড়তে থাক।

বলে সুবর্ণই মাছ দিতে যায়।

মাধুরী তরকারী নাড়তে থাকে।

মাসকাবারে সুবর্ণ হয়ত শুধোয়,—হ্যাঁরে মাধুরী, তোর সাবান ক'খানা চাই এ মাসে ?

মাধুরী বলে,—আমি কিছু জানি না, তুমি যা দেবে তাই।

সুবর্ণ মনে আনন্দ পেলেও মুখে বলে,—ভালো জ্বালায় পড়লুম তোকে নিয়ে। সবই দিদি জানে।

কথামত হয়ত বা সুবর্ণ শুধোয়,—হ্যাঁরে মেজঠাকুরপোর কটা জামা ধোপাবাড়ি যাবে ?

মাধুরী চুল বাঁধতে বাঁধতে বলে,—আমি জানি না ওসব। তুমি দেখে নাও গিয়ে।

—সে কি লো, নিজের সোয়ামীর কটা জামা জানিস না ?

মাধুরী মুখ টিপে হাসে,—তুমি ত' আছো। আমার দেখবার কি দায় পড়েছে।

সুবর্ণ রেগেই হয়ত বলে,—আমি মলে কি করবি শুনি ?

বলে নিজেই ধীরেশের ময়লা জামা বেছে ধোপা বাড়ি দিয়ে দেয়।

এমনি ভাবেই দিনগুলো বেশ কাটে। আরও দু বছর। সুবর্ণর একটি মেয়ে হয় ইতিমধ্যে। শরীরটা সুবর্ণর আরও ভেঙে পড়ে। ছেলে আর মেয়ে মাধুরীর কাছে থাকে বেশী সময়। সুবর্ণ হাড় কখানা নিয়েই আগের মতো কাজ করে চলে সংসারে। মেয়েটির নাম রেখেছে মাধুরী তপতী। তপু বলে ডাকে। আর ছেলের নাম রেখেছে সীতেশ। মহারাজ। ডাকে রাজা বলে।

মাধুরী মেয়েটিকে দেখে রাখে সুবর্ণকে কাজের সময় দিতে। তবু মেয়েটির উপর যে ওর খুব টান এমন কিছু নয়। কারো ওপরই বেশী আকর্ষণ অনুভব করা মাধুরীর স্বভাব নয়। আকর্ষণ ওর নিজের শরীরের ওপর, আর ঘুমের ওপর। দু'বেলা স্নান করতে গা ধুতে তিনঘণ্টা। সিঁদুর আলতা পাউডার মাখতে দু' ঘণ্টা, তারপর গল্প করে খেতে খেতে দু' ঘণ্টা, বাকী দশ বারো ঘণ্টা দিনে রাতে ঘুম। এই বিশঘণ্টা মাধুরীর নিজের জীবন তপস্যা। তারপর ছোটঠাকুরপোর সঙ্গে একটু ঠাট্টা হাসি, ধীরেশকে সন্তুষ্ট রাখা কোনমতে। এত কাজ মাধুরীর। আর কিছু ভাববার দেখবার সময় নেই।

ধীরেশ হোটেলকে বড় করবার জন্যে দিনরাত আপ্রাণ খেটে বাড়ি এসে মাধুরীর সুপুষ্ট দেহের রূপ তৃষ্ণায় বিকৃতভাবে বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে। তার অদম্য আবেগকে সে সংযত করতে পারে না, চায়ও না, এতে মাধুরীর দিকটা দেখাও সে প্রয়োজন মনে করে না। মাধুরী কি চায়, না চায় সেটা বড় কথা নয়, ধীরেশ যা চায়, সেটা তাকে পেতেই হবে। মাধুরী অনুভূতিহীন অন্ধের

মতো, আবেগহীন সেবার মত নিঃশব্দে নিজেকে ওর হাতে তুলে দেয়। জানে যে মাত্র এইটুকু নিষ্প্রাণ দানের বিনিময়ে ধীরেশ নিজেকে মাধুরীর পায়ে বিলিয়ে দেবে, সত্যি সত্যিই ধীরেশ মাধুরীর পা দু'খানার কাছে যে শুয়েও না থাকে মাঝে মাঝে এমন নয়।

সীতেশ এম. এ. পাশ করে এক স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকের কাজ নিয়েছে। মাস্টারী কাজটাই নাকি ওর ভাল লাগে। অধ্যাপকের কাজ পাবার উপায় নাই। এম. এ. খুব ভালভাবে পাশ করতে পারেনি। তাই স্কুলে থেকে বি. টি. পরীক্ষা দিয়ে যদি প্রধান শিক্ষকের পদ পাওয়া যায়, সেই চেষ্টা করাই ভাল।

কাজটির আদর্শ বড় সুন্দর। এক বিরাট সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে এর পেছনে। ভবিষ্যত সমাজের ধারক হবে যারা, তাদের মানুষ করে তোলবার ভার সীতেশের ওপর। কাজটির উদ্দেশ্য কত মহান! বীরেশ মনে মনে খুশীই হয়।

বলে,—আমার ইচ্ছে, আর একটা কোন বিষয়ে বরং আর একবার এম. এ. দিয়ে দে। মাস্টারী করেও ত' পারা যায়!

সীতেশ দাদার ইচ্ছের ওপর কোন কথা বলতে পারে না, বলে,—তা দেয়া যায়।

বীরেশ বলে,—আমার ত' কিছুই হোল না রে! তোরা যতটা পারিস উন্নত হবার চেষ্টা কর।

আমার ত' কিছু হোল না—কথাটা যখনই বীরেশ বলে, তখনই যেন ওর কণ্ঠে এক হতাশা, এক ভুলের অনুতাপের আবেগ প্রকাশ পায়। সীতেশের ভাল লাগে না। বীরেশ ব্যক্তিগত জীবনে কতটা বড় হতে পারত, সংসারে কত অর্থ আর সম্মান পেতে পারত। শুধু এই দিয়েই কি জীবন বিচার চলে?

বীরেশও হয়ত বোঝে।

তবু দৈনন্দিন জীবনের কঠোরতায় একথাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়াও যায় না যে কলেজে পড়ে সহজ সরল জীবনকে তখন মেনে নিতে পারলে, হয়ত বিদ্যায় অর্থে সম্মানে আজ কারো চেয়ে সে কম হোত না।

এক নগণ্য অফিসের নগণ্যতম কাজে জীবনের মুহূর্তগুলো এমন করে বৃথা নষ্ট করতে হোত না মাত্র কয়েকটি টাকার জন্যে।

শুধু কি তাই।

বীরেশের মনিবটি অতিমাত্রায় আত্মাভিমানী।

পৃথিবীতে বুদ্ধিমান যে আর কেউ থাকতে পারে—তার চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান—এমন একটা অসম্ভব কথা তিনি ভাবতেও পারেন না।

তাই সময়ে অসময়ে হয়ত বীরেশকেই বলে বসেন,—বুদ্ধি যখন তোমাদের নেই, তখন যা বলব তাই শুনবে। অনর্থক বুদ্ধি খরচ করবার চেষ্টা করে কাজ গোলমাল করে দিও না।

বীরেশকে বোকা সেজেই চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে হয় কথাগুলো।

তখন না মনে হয়ে পারে না যে সংসারের অতি বাস্তব বিচারের মানদণ্ডে সে আজ কতখানি ছোট হয়ে গেছে। মানুষ হিসেবে বীরেশের যত দামই থাক না কেন অন্য পাঁচজনের সামনে তার মনুষ্যত্বের মূল্য আজ কিছুই নয়।

বীরেশের অবচেতন মনে এক আক্ষেপ জমে ওঠে। শুধু চুপ করেই থাকতে পারে ও। মনকে ডুবিয়ে দিতে পারে আরও গভীর চেতনায়, যেখানে বাহ্যিক জীবনের অভিমানের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে কিছুক্ষণ প্রশান্ত হয়ে থাকতে পারে ও। বীরেশ এমন এক মানসিক চেতনায় নিজেকে ছড়িয়ে দেয় যেখান থেকে জীবনের গোটা কতক বছর নিতান্তই তুচ্ছ বলে মনে হয়, মনে হয় অনন্তকাল ধরে এমন কতবার সে জন্মেছে, কতবার নোতুন স্বাদ পেয়েছে নোতুন নোতুন জীবন অধ্যায়ের। আজকের বীরেশ রূপটি তার অনন্ত জীবনের একটি তরংগমাত্র, মিলিয়ে যাবে আবার উঠবে নোতুন তরংগ।

ও এক অনাস্বাদিত প্রশান্তির আনন্দে ডুবে যায় তখন। বাইরের মনটা ভরে ওঠে প্রেমে। মনে হয় সব ভাল, সবাই ভাল। আনন্দের এক একটি স্ফুরণ। ন্যায় অন্যায় যা কিছু সেগুলো ক্ষণিক মনোবিকারের বিকাশমাত্র। ওগুলো এতই তুচ্ছ যে ওগুলো দিয়ে জীবন বিচার চলে না।

বীরেশ মুগ্ধ হয়। স্তব্ধ হয়। নিজেকে যেন নিজে দেখতে পায়। আর সবাইকেও।

সেদিন রাত সাড়ে দশটার পরও সীতেশ বাড়ি ফিরছে না। সুবর্ণ এসে শুধোয় বীরেশকে,—তোমাদের খাবার দিই।

—সীতেশ এসেচে?—শুধোয় বীরেশ।

—না আসেনি এখনও। কিছুদিন ধরে ফিরতে একটু রাত হয় ওর।—বলে সুবর্ণ।

বীরেশের কপালের রেখা কুঞ্চিত হয়ে ওঠে,—কেন রাত হয় কিছু জানো?

সুবর্ণ হাসে,—তুমি শুধোলেই ত পারো।

—আমার চেয়ে তোমার বলাটাই ভাল। আমার কাছে হয়ত অনেক কথা বলতে সংকোচ করে।

—তাহলে ওরা আমারই বেশী আপনার হয়ে গেছে?

বীরেশ বলে,—সত্যিই তাই। তুমি যে আপনার করে নিতে পেরেছ, এতে আমার বড় আনন্দ সুবর্ণ।

—সবাইকেই পারলুম, একজনকে বাদে।—বলতে বলতে সুবর্ণর মুখটা শুকিয়ে ওঠে। বীরেশ হাসে,—আমার কথা ছেড়ে দাও। আমি একটা মানুষ!

সুবর্ণ এগিয়ে আসে। ঘুমন্ত ছেলেটির মাথার চুল ঠিক করে দিতে দিতে মুখটা নীচু করে বলে,—সত্যিই তুমি মানুষ নও।

বীরেশ ওর দীর্ঘশ্বাসটাও শুনতে পায়, বলে,—যাক ওকথা। সীতেশকে আজ জিজ্ঞেস কোর এত রাত হোল কেন?

সুবর্ণ মৃদু স্বরেই বলে,—আমি পারব না।

বীরেশের মুখটা গম্ভীর হয়ে ওঠে।

সুবর্ণ বীরেশের এই ধরনের গম্ভীর মুখ দেখলে ভয় পায়। বলে,—কি একটা টিউসানীতে যায়। খুব বড়লোকের বাড়ি। তাছাড়া কি বলে কোচিং-টোচিং আছে।

বীরেশ কিন্তু আর কথা বলে-না।

সুবর্ণ ভয়ে ভয়ে শুধোয়,—ভাত দোব?

—না।—গম্ভীর উত্তর বীরেশের।

সুবর্ণ দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে কাছে আসে।

বীরেশের বড় বড় চুলগুলো ঠিক করে দেয় আঙুল দিয়ে, বলে,—অমনি রাগ হোল ! আচ্ছা আমি কার ওপর রাগ করি বলোত ?

বীরেশ কথা বলে না।

সুবর্ণ আবার সীতেশের প্রসংগই তোলে,—ছোটঠাকুরপো যেন একটু রোগা হয়ে যাচ্ছে এদানিকে।

বীরেশ নীরব।

আচ্ছা বাপু, অন্যায় হয়েছে, ঘাট হয়েছে।

বীরেশ এতক্ষণে বলে,—অন্যায় তোমার নয়, সব অন্যায়ই আমার।

বাইরে চটির শব্দ পাওয়া যায়।

—যাই ছোটঠাকুরপো এলো। শুধোইগে, কোথায় গিয়েছিলো।

বীরেশ বারণ করে,—না, ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

—দিচ্ছি।—বলে সুবর্ণ বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

বীরেশ চুপ করে বসে থাকে। সীতেশ এত দেরি করে কেন ? কোন কোনদিন বারোটা, সাড়ে বারোটা বেজে যায়।

ছেলেমানুষ, যদি কোন ভুল করে বসে জীবনে যা আর শোধরাতে পারবে না। কিছুই বিচিত্র নয়।

একটু পরেই গেঞ্জীটা খুলতে খুলতে সীতেশ ঘরে ঢোকে,—দাদা, আমায় ডেকেছো ?

বীরেশ ওর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকায় যেন ওর ভেতরটা দেখে নেবার চেষ্টা করে।

সীতেশ দাদার চাউনী দেখে মাথাটা নীচু করে।

বীরেশ মৃদু কণ্ঠে শুধোয়,—এত রাত হোল কেন রে ?

ওই পড়াতে পড়াতে।

কোথায় পড়াস ?

কালীঘাটে। খুব বড়লোকের বাড়ি।

শুধু পড়াতে এত দেরি ?

সীতেশ কখনও মিথ্যে বলে না দাদার সামনে, বলে,—না, শুধু পড়াতে নয়।

তবে ?

একটি ছেলের সঙ্গে গল্প করতে করতে রাত হয়ে যায়।

বীরেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর খুব আস্তে বলে,—খুব বেশী রাত করিসনি আর।

সীতেশ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পর ওরা ভাত খেয়ে এসে শুয়ে পড়ে।

বিছানায় শুয়ে সীতেশের ঘুম হয় না। রাত ত' কালও হবে। কাল শোভনাদের হোস্টেলের থিয়েটারে ওর নিমন্ত্রণ। না গেলে কি মনে করবে শোভনা। দাদাকে বলে যাবে না হয়। তাও যেন কেমন বাধোবাধো লাগে।

না হয় যাবে না। কিন্তু যাবে না ভাবতেই শোভনার অভিমানী মুখটা ভেসে ওঠে ওর মনে। শোভনাকে ও ভাল করেই চেনে। প্রথম আলাপেই ত' শোভনার চরিত্রটি ওর কাছে পুরো ধরা পড়েছে।

পড়েছে কি! হয়ত বা ভুলই ভাবে সীতেশ। শোভনাদের চরিত্র ধরবার মত পরিণত বুদ্ধি হলে একথা ভাবতো না।

আলাপটা সত্যিই অপূর্ব।

শোভনার দাদা প্রবীর সান্যালের ছেলেকে পড়ায় সীতেশ।

প্রবীর সান্যাল। দু' হাজারী অফিসার। মাতাল। সংসারে শুধু টাকা দিয়েই সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়।

প্রবীর সান্যালের বিদুষী স্ত্রী সুলেখা সান্যাল সংসার পালন করে এক ছেলে দু মেয়ে নিয়ে।

শোভনার সঙ্গে সুলেখার বিশেষ বনিবনা নেই। ননদ ভাজ। দা আর মাছ।

প্রবীর শোভনাকে হোস্টেলে রেখে পড়ায় তাই। স্ত্রীর কাছ থেকে তফাতে রাখে।

শনিবার রোববার প্রবীর বাড়ি থাকে। তখন হোস্টেলে থেকে আসে শোভনা।

শোভনা বি. এ. পড়ছে। প্রবীরের ছেলে ম্যাট্রিক।

সেদিন রবিবার।

শোভনা এসেছে। সীতেশ কি একটা পড়া ভাল ক'রে অনেকক্ষণ বুঝিয়ে দেবার জন্যে রোববার বিকেলে এসেছে। সাধারণতঃ শনিবার রোববার সীতেশ আসে না।

ছেলেটিকে নিয়ে বসেছে পড়বার ঘরে।

ছেলেটি শোভনার খাতাটা নিয়েই তাতে দুটো রচনা লেখা শুরু করেছে।

শোভনা ঘরে ঢোকে,—খোকা, আমার খাতাটা দেখেছো ?

ঘরে ঢুকে সীতেশকে দেখে শোভনা থমকে দাঁড়ায়।

শোভনার কুঞ্চিত চুলের দুটি ছোট বিনুনী এসে পড়েছে বুকের ওপর। শাড়ীটা নেহাৎই অগোছালো। চোখদুটো ফিঙের মত নাচে। ঝিলিক দেয় যেন বর্শার ঝক্‌ঝকে ফলার মতো।

সীতেশকে দেখেই শোভনা নীচের ফুলো পাতলা ঠোঁটটি কামড়ে শাড়ী সামলে নেয়।

সীতেশ চোখ তোলে।

সীতেশের প্রশান্ত চোখের ওপর শোভনার চোখের তারাদুটো চমক দেয় দুবার।

সীতেশ ছাত্রকে বলে এবার,—লেখো। পনেরো মিনিটের ভেতর লিখতে হবে।

খোকা শোভনার দিকে দুবার তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বলে,—পিসীমার খাতা যে।

—তা হোক। লেখো।—সীতেশ অগ্রাহ্য করে ওর কথা—সঙ্গে সঙ্গে পিসীমাকেও।

তরুণী পিসী শোভনা ভ্রূদুটো কোঁচকায় দুবার।

আগেকার স্বরে বলে,—খোকা, খাতা দাও।

খোকা পিসীর দিকে তাকাতেই সীতেশের আদেশ কানে আসে,—লেখো। দেরি হয়ে গেল।

শোভনা সীতেশের স্পর্দ্ধায় বিস্মিত হয়। একটা মাস্টারের এত স্পর্দ্ধা।

বলে—খোকা উঠে এসো। যে মাস্টার ভদ্রতা জানে না সে আবার শেখাবে কি ?

সীতেশ উঠে দাঁড়ায়,—এই অর্বাচীন মেয়েটি তোমার কে হয় খোকা ? পিসীমা ? তোমার বাবাকে ডাকো।

শোভনার মুখ চোখ রাঙা হয়ে ওঠে,—অসভ্য। অভদ্র !

খোকা বেগতিক দেখে ডাকে,—বাবা !

প্রবীর সান্যালের চটির শব্দ পাওয়া যায়।

ঘরে ঢুকতেই শোভনা বলে—এই অসভ্য লোকটা আমায় অপমান করেছে দাদা।

সীতেশ কিছু বলবার আগেই প্রবীর শোভনাকে বলে,—ছিঃ। মাস্টার মশাইকে কি যা তা বলছো ?

শোভনা তবু নালিশ জানায়—তাই বলে আমায় যা নয় তাই বলবে ?

—হতেই পারে না। উনি তেমন মানুষ নন। ওকেও জানি, তোমাকেও আমি চিনি।

শোভনার চোখদুটো রাঙা হয়ে ওঠে। ছলছল করে, গলা কাঁপে, বলে, —তা ত' বটেই। সব দোষই আমার। চিরদিনই সব দোষ আমার। চললুম আমি, আর কখনো আসব না এ বাড়ি।

সীতেশ গিয়ে দোরের সামনে দাঁড়ায় পথ আগলে। হাত জোড় করে।

—মাপ করুন আমায়। স্বীকার করছি দোষ আমারই।

শোভনা তাকায় সীতেশের দিকে, চোখে জল ওর টলমল করছে।

প্রবীর সান্যাল ভ্রূদুটো কুঁচকে বলে,—যেতে দিন ওকে।

বলে চটির শব্দ করে ভেতরে চলে যায়।

শোভনা চলে যেতে চায়।

সীতেশ বলে,—তবে আমার সঙ্গেই চলুন।

—না—বলে শোভনা এগোয়।

সীতেশ পেছন পেছন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে।

—কোথা যাবেন ?

শোভনা উত্তর দেয় না। ট্রামে ওঠে।

সীতেশও ট্রামে ওঠে।

—টিকিট।

শোভনা হাতথলিটি হাতড়ায়। রাগের মাথায় টাকার ছোট থলিটি ফেলে এসেছে বইয়ের এ্যাটাচির ভেতর।

সীতেশ মৃদু হেসে পয়সা দেয়,—দুখানা। ছ' পয়সা।

টিকিট কেটে বসে থাকে সীতেশ। শোভনাও।

ট্রাম ডিপোতে এসে যায়।

সীতেশ শুধোয়,—নামবেন না?

—না।

সীতেশ হাসে,—খেপলেন নাকি! চলুন নামি। মাঠে বেড়ান যাবে।

শোভনা নীরবে নামে।

সীতেশ পাশে আসতে ভরসা পায়,—চলুন।

এবার শোভনা শুধোয়,—কোথায়?

—যেখানে হোক। মাঠের একধারে ভেতরে গিয়ে বসা যাক বরং।

দুজনে এগোয়।

দু'আনা চীনেবাদাম কেনে সীতেশ,—খাবেন?

শোভনা তাকায় সীতেশের দিকে, বলে রেগে,—আপনি কি ঠাট্টা করবার আর জায়গা পেলেন না?

—আ! ক্ষমা চাইছি। চীনেবাদাম খান না বুঝি!

—খাবনা কেন?—বলে হাত বাড়িয়ে দুটো বাদাম নিয়ে খায় শোভনা। মন্দ লাগে না।

বাদাম খেতে খেতে বেড়ানো। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

ওর জীবনে এমন করে বেড়ান কখনও হয়ে ওঠেনি। বেড়াত দাদার গাড়িতে নয়ত' ট্যাক্সিতে কোন কাফে বা রেস্তোঁরায়।

একঘেঁয়ে হয়ে গিয়েছিলো সেটা।

আজ বেশ নোতুন স্বাদ পাওয়া গেল।

বলে,—আর দুটো বাদাম দিন।

সীতেশ বলে,—বাঃ! সব সাবাড় করে দিলেন যে। আমি খাব না?

—কিনুন না! আরও কিছু।

—অত পয়সা নেই।—বলে পকেটটা হাঁতড়ায় সীতেশ।

শোভনা চমকে তাকায়,—বলেন কি, আর পয়সা নেই। ফিরব কি করে?

সীতেশ তেমনি মৃদু হাসে,—কিন্তু আপনি যে ফিরবেন না বললেন। চিরদিনের জন্যে বেরিয়ে এলেন।

—থামুন, চলুন একটা ট্যাক্সি নি। বাড়ি গেলে দাদা ভাড়া দিয়ে দেবে।

—দেবে কি? যা চটেছেন!—আস্তে টিপ্পনি কাটে সীতেশ।

শোভনা বলে,—না দেয়, আমার ব্যাগে টাকা আছে। চলুন।

—সবুর।—সীতেশ থামায়,—একটু জিরোই। তারপর যাব।

—কোথায় জিরোবেন?

—এই ঘাসের ওপর। বসুন, রুমাল পেতে দিই।

পকেট থেকে রুমালটা বার করে পেতে দেয় সীতেশ।

শোভনা একটু বসে।

সীতেশ শেষ বাদামটা চিবোতে চিবোতে বলে,—আপনার নামটা ত শোনা হোল না?

শোভনা বাদাম খায়,—নাম কি হবে? নাম ধরে ত' আর ডাকছেন না?

সীতেশ নুন ঝাল খাচ্ছিল।

—কই, একটু ঝাল নুন দিন ত!—হাত বাড়ায় শোভনা!

সীতেশ বলে,—আর ঝাল খেয়ে কাজ নেই। এমনিতেই আপনার মুখের ঝাল কম নয়।

শোভনা রাগে না,—এখন ত' অনেক শান্ত হয়ে গেছি।

—তাই নাকি?—সর্বনাশ!—চোখ বড় বড় করে সীতেশ।

শোভনা তাড়া দেয়।—কই উঠুন এবার।

—আর একটু বসি।—বলে এপাশ ওপাশ তাকায় সীতেশ, বলে,—ওই যে

ছেলেকটা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে হিংসে। দেখে কেমন লাগছে আপনার?

—ভাল না। কি ভাবছে ওরা।

—আমার ভালই লাগছে।

—তবে আর আমি বসব না। আপনার ভাল লাগতে শুরু হলে আমি গেছি।

—কেন?

—এসব ভাল লাগা ত' কত দেখলাম।—বলে শোভনা গম্ভীর স্বরে।

সীতেশ নীরবে ওঠে এবার। শোভনাও ওঠে।

ট্যাক্সি করেই দুজনকে ফিরতে হয়।

এরপর বিশেষ করে শনিবার রোববারই সীতেশ ছেলেটিকে পড়াতে যেতে শুরু করলো।

শোভনা বুঝত। বলত' না কিছু।

একটু বরং বসে গল্প সল্প করত সীতেশের সঙ্গে। বেচারী ওর জন্যেই ত' এত কষ্ট করে আসে। কিছুটা খামখেয়ালী। শোভনা হয়ত বা এক একদিন এমন গল্প শুরু করলো যে রাত সাড়ে এগারোটাই বেজে গেল হয়ত।

সেদিন সন্ধ্যায় শোভনা হোস্টেল থেকে ফিরেছে। শনিবার।

ওপরে উঠে কানে আসে তার সম্বন্ধেই আলোচনা হচ্ছে দাদা বৌদির।

বৌদি বলছে—মাস্টার শনিবার রোববার কেন আসে তাও বোঝ না।

—বুঝে কি করতে বলো!—বলে প্রবীর সান্যাল।

বৌদি বলে—ওর সঙ্গে অত মিশলে ত' শোভনার ভবিষ্যতটা নষ্ট হয়ে যাবে। একটা গরিব মাস্টার!

প্রবীর সান্যালের হাসির শব্দ শোনা যায়—দেখো সুলেখা, জীবনে বহু পয়সা রোজগার করলাম। বহু আভিজাত্য দেখলাম। কলকাতার সব চেয়ে বড় বড় ক্লাবে সোসাইটিতে মিশেছি অন্তত চারশ মেয়ে সাতশ পুরুষের সঙ্গে। ওরা সবাই মানুষকে মাপে ব্যাংকের খাতার অংকের মাপে। ওই রকম একটা হাজারী অফিসার চাই শোভনার জন্যে?

—নিশ্চয়ই চাই।

—চাও ত' দু চার গণ্ডা এনে দিতে পারব। কিন্তু আমি চাই না বলেই এতদিন তাদের ভিড় করতে দিইনি বাড়িতে। আমি জানি ওরা মনের দিক থেকে ব্যাংক্‌রাপ্ট্‌! প্রাণ নেই।

—তোমার মতলবটা কি শুনি, ওই হাবাতে মাস্টারটার সঙ্গে শোভনা নষ্ট হলো। মাস্টারটাকে কালই বিদেয় কোরব আমি।

—তা করো। কিন্তু জেনো যে ওই গরিব মাস্টারটি ফাঁপা নয়। ও মানুষ। নেহাৎ যদি শোভনা ওকে পছন্দই করে ফেলে তাতে ওর মংগল হবে।

—কি যা তা বলছ তুমি?—বৌদির ভীত কণ্ঠ।

—ঠিকই বলছি।—বলে প্রবীর সান্যাল।

প্রবীর সান্যাল চিরদিনই একটু ভাবুক লোক। কথাগুলোর ভেতর একটা আবেগ থাকেই। তবু কথাগুলো শুনতে যেন খারাপ লাগে না।

শোভনা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

দাদা তাকে এমন করে ত্যাগ করতেও প্রস্তুত হয়ে রয়েছে!

কি জানি কেন এক সুতীব্র অভিমানে ওর বুকটা ভরে ওঠে। দাদার কথাগুলোর ভেতর গভীর সত্য যেটা, সেটা মনকে যে নাড়া না দেয় তা নয়। কিন্তু তবু যেন মনে হয় দাদা কেন তাকে এত নিচে নামিয়ে দিতে চায়!

সীতেশ। একটা স্ট্রীট্‌ বয়! বিদ্বান তবু বিত্তহীন ত' বটে।

আবার মনে হয় হোক না গরিব। অমন প্রাণ ভরা পুরুষই দেখা যায় কটা?

সীতেশকে ওর যে কোন সময় একেবারে ভাল লাগেনি তা' নয়। তবু সীতেশই যে তার মতো মেয়ের পক্ষে একটি যথেষ্ট সুযোগ্য পুরুষ, এমন কথা দাদা ভাবতে পারল কি করে! নিশ্চয়ই দাদা তাকে অনেকটা নীচু চোখে দেখে।

শোভনার মনটা এক আবছা দ্বন্দ্বছায়ার দোলা খায়। নিজের পুরো মনোরূপটা নিজেই যেন দেখতে পায় না ভাল করে। নিজে বুঝতে পারে না ওর কি করতে হবে এমন একটা অবস্থায়।

মনের দুর্নিবার এক বেগ অনুভব করে শুধু। নিজেকে সমর্পন করতে হয় সে বেগের কাছে। যেখানে ভাসাবে ভাসাক। বিচার করে সংযত হবার মত শান্ত শক্তি তার নেই।

মনে হয় সীতেশকেই সে চায় তার স্বামী বলে দেখতে। দাদা যদি তাকে এত নীচু ভাবতে পারে তবে সে তাই-ই হবে। আর সীতেশও তো ছেলেটি বড় ভাল। স্বামীত্বে একটি ভালোমানুষকেই বরণ করা যায়। তাতে দৈনন্দিন শান্তিটা বজায় থাকে। উপভোগের জন্যে সীতেশ নয়। সীতেশ আটপৌরে। বহিরংগ ভোগ মেটাবার জন্যে ট্রাউজার পরা ধোপদুরস্ত ছেলে অনেক আছে। ওরা শোভনার শাড়ির আঁচল ধরতে পারলে জীবন ধন্য মনে করবে।

এরপর শোভনা যেন আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল সীতেশের সঙ্গে। মাঝে মাঝেই রাত হতে লাগল বড় বেশী।

বীরেশ সেদিন বলসে যখন, রাত করলে ভাবনা হয়—সীতেশ যেন নিজেকে অসহায় বোধ করতে লাগল। শোভনাকে সে কি করে একথা বলবে যে বেশী রাত করা তার সম্ভব নয়।

দাদার উপরেও এ ব্যাপারে সীতেশ একটু যে বিরক্ত হোল না এমনও নয়। তবু চুপ করেই রইল। সেদিন রাত্রে আবার দেরি হোল। এবার প্রায় সাড়ে বারোটা।

সীতেশের দোষ কিছু ছিল না।

শোভনা সেদিন সব কথাই বোলল ওকে। সব। বিয়ের কথাও।

প্রবীরের ছেলের পড়বার ঘরেই বসে ছিল ওরা। প্রবীর আর সুলেখা গিয়েছিল এক নিমন্ত্রণে—ছেলে সমেত।

শোভনা এ সুযোগ ছাড়লো না।

আপত্তি জানালো সীতেশ, কিন্তু আপনার দাদা কি বলবেন?

শোভনা জানালো না যে দাদার মত আছে, শুধু বলল—সে আমি বুঝব।

—বুঝুন। কিন্তু আমার দাদা তো আজই রাগ করবেন মনে হচ্ছে।

—আপনার দাদা বুঝি খুব সাংঘাতিক লোক?—শোভনার কণ্ঠে একটু বিরক্তি।

সীতেশ বলে,—ঠিক সাংঘাতিক নয়, তবু তার কথা অমান্য করতে সাহস পাইনি আমরা কখনও। বড় অদ্ভুত মানুষ। আলাপ হলে বুঝতেন। আমাদের এত ভালবাসেন, কিন্তু ভালবাসায় কোন প্রশ্রয় নেই।

শোভনা একটু বা রাগে—থাক, দাদার কথা বলতে গেলে আপনার এক রাতেও কুলোবে না। আসলে আপনার ব্যক্তিত্ব নেই বলে তার কাছে অত নীচু হয়ে থাকেন।

সীতেশ একটু আহত হয়,—ঠিক বোলতে পারব না। তাঁর কাছে নীচু উঁচুর প্রশ্ন ওঠে না। তিনি নিজে তো কত নীচু হয়ে থাকেন আমাদের কাছে—

—থামুন তো।—থামায় শোভনা.—দাদার কথা রাখুন।

পরে একটু আস্তে বলে,—আপনার নিজের কথা তো কিছু বললেন না ?

—কি কথা ?

—তাও কি আমায় বলে দিতে হবে ?

সীতেশ বোঝে তবু লজ্জিত হয়। মেয়েদের সামনে ভালবাসার কথা বলতে প্রথম বাধে বই কি !

কান দুটো রাঙা হয়ে উঠে। হাত পায়ের তালু ঘামে। নিজেকে বড্ড হালকা মনে হয়।

সীতেশ চোখ নীচু করে বলে, খুব আস্তে,—আমার দু' একটা কথা বলবার ছিল সত্যিই।

—বলুন।—শোভনা একটু এগিয়ে এসে ওর দিকে তাকায় চোখ দুটো পুরো মেলে ধরে। মনের মধু চোখে উপচে পড়তে চায় ওর। শোভনা জাদু জানে।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে সীতেশের বুকটা সত্যিই কেঁপে কেঁপে ওঠে।

বলে,—আমরা কিন্তু খুব গরীব।

—জানি।

—তাই বলছিলাম, এই তো বেশ। দৈনন্দিন অভাবটা সইতে সকলে পারে না।

—এমন একটা সিদ্ধান্ত আগে থেকে ভেবে নিলেন কি করে ?

—খুব একটা অসম্ভব কথা ভাবিনি।

—তর্ক করতে চাইনে। আপনার নিজের কথাটাই জানতে চাই।

শোভনার অভিমানটা লক্ষ্য করে একটু হাসে সীতেশ—আমার কথা কি কিছু আজও জানাতে বাকী আছে?

—তবু স্পষ্ট করে শুনিনি কখনও।

—এ কথা তো অত স্পষ্ট করে বলা যায় না।

—খুব যায়।

সীতেশ আবার মৃদু হাসে,—স্পষ্ট করে কি ছাই নিজেই জানি? যা নিজে জানি না, তা বলি কি করে?

—আবার হেঁয়ালী! আপনি কি কবিতা লেখেন?

—না কবিতা দেখি।

শোভনা এতক্ষণে হাসে,—মানে?

—এর মানে বলতে হয় না। আমার যে কবিতা তাকে তো দেখতেই পাই। তাই তো তাকে সংসারের দিনগুলোর খাঁজের ভেতর নামাতে ভয় হয়।

—হারাবার ভয়?

—অনেকটা তাই।

শোভনা পরিষ্কার কথা বলতে ভালবাসে, কাছে আসে, বলে,—আমাকে হারাবার ভয় নেই।

সীতেশ হঠাৎ ওর আরও কাছে আসে। পাশাপাশি।

এতদিন পরে আজ ভাল করে চোখ মেলে তাকায় ওর দিকে।

ওরে ভেতরে, ওর অন্তরে।

ওর সর্বাংগের ঝলমলানি। ওর চোখের চঞ্চল দীপ্তি। ওর কুঞ্চিত চুলের এলো খোঁপা। ওর সাদা দুখানা হাত। শুধু হাত।

সীতেশ হাতটি ধরে ওর।

শোভনা সরে বসে না। ওর কাছে এটা নোতুন কিছু নয়।

তবু সীতেশের প্রশান্ত স্পর্শে ওর মনের চাঞ্চল্যকে থিতিয়ে দেয় জমিয়ে দেয় যেন ভাব তরঙ্গের অসংখ্য বুদ্বুদ আর ফেণাগুলোকে।

গভীর করে দেয় ওকে। ওর স্বভাবের গতিকে শিথিল করে দেয়।

সীতেশ গভীর হয়ে ওঠে আরও।

—সত্যিই তুমি হারাবে না।

শোভনার কি জানি বুকটা কাঁপে। এমন তো কখনও হয় না।

তবু বলে - না।

কিন্তু কণ্ঠে তেমন জোর পায় না।

সীতেশ ওর হাতটা আলতো করে ধরেই বলে—কিন্তু তুমি তো নিজেকে নিজে জানো না?

—কে বললে।

—আমি বলছি।—সীতেশের গভীর স্বরে প্রতীতির প্রকাশ।—আমি জানি। আমি তোমাকে জেনেছি। অনেক রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে তোমাকে ভেবেছি। তাই তোমাকে এত করে জানতে পেরেছি। তুমি স্বভাব

শোভনা ওর দিকে হেলে পড়ে বলে,—তুমি শিখিয়ে নিও। তুমি জানিয়ে দিও।

—কিন্তু নির্ভর করাও যে তোমার স্বভাব নয়।

—স্বভাবকেও বদলানো যায় প্রেমে। তাই নয়।

—প্রেম!—সীতেশ হাসে একটু,—ও অনেক ওপবের কথা। তবু আমি তোমাকে কথাই দিলাম শোভনা। তুমি যা চাইবে, তাই-ই পাবে।

—তবে আর দেরি নয়।

—কিন্তু আমার দাদা?

—তোমার দাদার কাছে যাব আমি।

—পারবে? সাহস আছে?

এবার হাসল শোভনা,—তুমি যে আমাকে জানো বলেছিলে, সবটা জানলে এ প্রশ্ন করতে না।

—তবে কালই চলো।

—বিকেলে।

—হ্যাঁ।

শোভনা সীতেশের জামার হাতাটা গুটিয়ে দিতে থাকে এবার।

দুটো হাতাই গুটিয়ে দেয়।

অনেকক্ষণ বসে থাকে দুজনে।

আস্তে আস্তে ভাঁজ করে করে হাতাটা ঠিক করে বলে শোভনা,—হাত গুটিয়ে জামা পরতে পারো না ?

—কেন, কার সঙ্গে মারামারি করতে হবে ?—সীতেশ হাসতে হাসতে বলে।

—আমাকে আগলাতে হবে না। তোমার যা ভয় !

—ভালবাসতে পারলে আগলাবার দায় নেই কিছু।

—রাত কিন্তু অনেক হোল।

—তাড়াতে চাও নাকি।

—তবে খেয়েই যাও না এখান থেকে। দাদা খুশী হবে।

—আপত্তি নেই। রান্নাটা তোমার নিজের হলে আরও খুশী হতাম।

শোভনা হাসতে হাসতে ওঠে—আচ্ছা আমি নিজে ডিম ভেজে দোব। বলে চলে যায় ভেতরে।

নিজে হাতে ডিম ভেজে ডিসে ভাত নিয়ে আসে শোভনা।

সীতেশ ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

মুখ টিপে হেসে বলে শোভনা—কি দেখছ ?—বলে কোমরে আঁট করে বাঁধে আঁচলটা।

—পুরুষের সেবায় মেয়েদের কত সুন্দর দেখায় তাই দেখছি।

শোভনা হাসে। বলে—এই সব স্তুতি করেই তোমরা সেবা আদায় করো।

সীতেশ ওর দিকে তাকিয়ে থেকেই বলে—স্তুতি নয়। সত্যি যা তাই বললাম। ভাতের থালা আনবার সময় নীচের ঠোঁটটা কামড়ে কত সাবধানে আসছিলে। কপালে কিছু কিছু ঘাম জমেছে। পরিশ্রমে শ্রান্ত চোখ দুটোয় তবু কি তৃপ্তি তোমার।

—থাম। থাম। তুমি নিশ্চয়ই কবি!

—এ কবিতা নয়। সত্য দেখবার চেষ্টা।

—নাও। এবার খেয়ে নাও। দাদা এসে পড়বে এখুনি।

—এলে তো ভালোই।

শোভনা এক গেলাস জল আনতে ভেতরে যায়।

খাওয়া সেরে সীতেশ যখন বাড়ি ফেরে তখন রাত সাড়ে বারোটা।

বাড়ি ঢুকে দেখা হয় মাধুরীর সঙ্গে।

—ওমা! ঠাকুর পো কোথায় ছিলে গো! এদিকে—।

সীতেশ ওকে আস্তে কথা বলতে ইসারা করে.—দাদা ঘুমিয়েছে?

—কচু! খাননি এখনও। জেগে বসে আছেন। মেয়েটাকে ঘরে আনলেই তো হয় বাপু!

—কি বোলচ! মেয়ে আবার কিসের?

মাধুরী দুষ্টুমী-ভরা চোখে বলে,—থাক। আর মাছ ঢাকতে হবে না। দিদি বলছিলো তুমি তো দাদাকে বলেছ একটি মেয়ের কাছে যাও!

—এর ভেতরে আঁড়ি পেতে শোনা হয়ে গেছে। একেই বলে মেয়েছেলে!

—আর পুরুষ বুঝি খুব ভাল। লুকিয়ে লুকিয়ে একটা মেয়ের মন জবাই করবার চেষ্টা! শোন, সুধা দা চিঠি দিয়েছে তোমাকে।

—কই দেখি।

মাধুরী আঁচল থেকে ভাঁজকরা খামখানা দেয় সীতেশের হাতে। সুধা মাধুরীর আপন মাসতুতো ভাই। সীতেশের বন্ধু। এক সঙ্গে পড়ত। ক্লাস এইট্ অব্দি পড়ে বাড়ির কিছু টাকা নিয়ে বোম্বাই পালিয়ে যায়। সেখানে কি যে করে কেউ বিশেষ জানে না। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসে। আবার চলে যায় বোম্বাই। এখন নাকি টাকাও করেছে অনেক। বলতে কি মাধুরীর বিয়েটা সুধাকান্তই দিয়েছে। সুধাকান্তই সীতেশের কাছে কথাটা পাড়ে। তারপর খরচও করে প্রায় শ' আষ্টেক টাকা। মাধুরীর বাবা তো খুবই গরীব। টাকা দেবে কোত্থেকে। সুধাকান্তর মনটা দরাজ। তা ছাড়া

ছোটবেলা থেকেই মাধুরীকে ও নিজের বোনের মত ভালবাসে। টাকা দেওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। আটশ টাকা ওর কাছে মাসের রোজগারের সিকি ভাগ। এখনিই তো শোনা যায়। সেই সুধা চিঠি লিখেছে।

সীতেশ চিঠিটা পকেটে রেখে দাদার ঘরের দিকে এগোয়। জানে দাদা হয়তো বা কিছুই বলবে না। তবু বুকটা কাঁপে দাদার সামনে যেতে। ঘরে ঢুকে দেখে দাদা বসে বই পড়ছে একখানা। সম্ভবতঃ গীতা। ও বইটা যে কতবার পড়েছে দাদা তার ঠিক নেই। তবু আবার পড়ে। কি যে পায় ও বই থেকে কে জানে।

বীরেশ সীতেশকে দেখে বইটা বন্ধ করে। একটু হেসে বলে,—তোর আজ অনেক রাত হোল তো ?

—হ্যাঁ।

—সেই পড়াবার বাড়িতেই ছিলি বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, যা, খেয়ে শুগে যা। রাত হয়েছে।

বলে বীরেশ আবার বইটা পড়তে শুরু করে।

সীতেশ তবু যায় না।

ও জানে দাদার সব কথা বলা হয় নি। এত সহজে এমন ব্যাপারটা মিটে গেল এ যেন ভাবতেই কেমন লাগে।

বীরেশ সীতেশের দিকে তাকায়।

স্বর্ণ ঘরে শুয়ে মেয়েটাকে ঘুম পাড়াচ্ছিল।

বীরেশ তাকে বলে,—তুমি এ ঘর থেকে যাও তো।

স্বর্ণ ওঠে। সীতেশের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বীরেশ উঠে দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে বলে,—কিছু বলবি ?

সীতেশ মুখটা নীচু করেই বলে,—মেয়েটি আমায় বিয়ে করতে চায়। আজই বলছিল।

বীরেশ অনেকক্ষণ কোন কথা বলে না।

তারপর বলে,—তা বেশ তো! মেয়েটির কে আছে?

—ওর দাদা আছে। মস্ত বড় অফিসার। বোনকে তেমন দেখে না। তা ছাড়া ও দাদার কাছে থাকেও না। বি. এ. পড়ে। হোস্টেলে থাকে।

—কেন, দাদা কি খুব খারাপ মানুষ?

—কি জানি। ওকেই জিজ্ঞেস কোর। ও কাল আসবে। বিকেলে, তুমি বাড়ি থেকো।

বীরেশ চুপ করে ভেবে বলে,—তা থাকা যাবে। চল এবার খেয়ে আসি।

—আমি খেয়ে এসেছি।

বীরেশ আবার থমকে যায়।

একটু ভেবে বলে,—বেশ তো, তবে শুগে যা।

সীতেশ চলে যায়।

নিজের ঘরে এসে দেখে মাধুরী আর স্নবর্ণ হেসে লুটোপুটি।

—ওমা! পেটে পেটে এতো!

—কি এত শুনি?—সীতেশও হাসে।

মাধুরীর হাসিটাই বেশী।

সীতেশ গাম্ভীর্য নিয়ে বলে,—রাত হয়েছে, যাও তোমরা শুতে যাও।

মাধুরী সীতেশের বিছানায় গড়াতে গড়াতেই বলে,—ভালোমানুষের মতো কথার উত্তর দাও তো চলে যাব। নইলে ভররাত আজ জ্বালাবো তোমায়। মেয়েটির নাম কি?

—কোন মেয়েটি?

মাধুরী চোখ বড় বড় করে গালে হাত দেয়,—ওমা! সাধু পুরুষ! কিচ্ছু জানেন না! যে মেয়েটি আর কদিন পর এ বিছানায় শোবে। বলো নাম কি?

—ঝুঁচকী বালা দেবী।—গম্ভীর হয়ে সীতেশ বলে।

স্নবর্ণ আর মাধুরী হেসে আবার লুটোপুটি।

—বয়েস কতো?

—আটচল্লিশ।

—তুমি কি তার তৃতীয় পক্ষের বর ?—মাধুরী খোঁচা দেয়।

—কৃষ্ণপক্ষের। শুক্লপক্ষ তার বয়ে গেছে।—সীতেশও এবার মৃদু হাসে।

—ও দিদি শুনছ ?

মাধুরীর কথায় সুবর্ণ হাসতে হাসতে বলে,—ওর সঙ্গে কথায় পারবার জো নেই। চল, ওকে একা একা ভাবতে দে।

—তাই চলো।—বলে মাধুরী হাসতে হাসতে সুবর্ণর পিছন পিছন বেরিয়ে যায়।

সীতেশ তার বিছানায় বসে এতক্ষণে সুধাকরের চিঠিটা খোলে। আশ্চর্য ছেলে এই সুধাকর। বিয়ের ঠিক আগেই সেই যে চলে গেল। আর পাত্তা নেই। অথচ মাধুরীর বিয়েতে টাকাও তো কম দেয় নি। ওর যেন বাঁধনটা ঠিক সয় না। আটকা পড়লেই ছট্‌ফট্‌ করে। চিরটা কাল। স্কুলের কথাও তো মনে আছে। কোনদিনও স্কুলের ঘরে ক্লাসের পর ক্লাস আটক থাকতে পারত না। দুটো ক্লাস হবার পরই আরেকটা ক্লাসে সুধাকরকে পাওয়া যেত না। হয়ত বা স্কুলের পাঁচাল ডিঙিয়ে পাশের গলিতে বিঁড়ি টানতে চলে গেছে। সীতেশ ছিল ভাল ছেলে। ওরা ধারণাই করতে পারত না সুধাকরের সাহসের বহর। ওরা মুখে সুধাকরের নিন্দে করত, ঘৃণা প্রকাশ করত ; কিন্তু মনে মনে ওর বোম্বেটে ভাবটা প্রশংসা না করে পারত না। খারাপ হবার জন্যে যে পরিমাণ সাহস প্রয়োজন, সেটা তাদের নেই, এ কথাটা ভালছেলের দল মর্মে মর্মে অনুভব করত। শুধু মুখে বলত, বদ্‌মাইস ! হাড় বদ্‌মাইস !

সংসারে খুব বেশী খারাপ হওয়া খুব সহজ নয়—এ কথাটার ভেতরের সত্য তার জীবনে সুধাকরই প্রমাণ করেছে। ক্লাস এইটে উঠে সুধাকর একদিন বললে এসে,—ঠিক কোরে ফেলেছে সে বম্বে যাবে। ওর কাকা সেদিন মেরেছিলো খুব। হয়ত বা তাই।

তারপর সুধাকরের কাছেই শুনেছে তার বম্বের জীবন কাহিনী। বাঙালী বিখ্যাত অভিনেতা থেকে শুরু করে—কেমিক্যাল কোম্পানীর বাঙালী বড় সায়েবের কাছে ভিক্ষে করে খিদে মেটানো। তারপর এনামেলের বাটি

গামলার ব্যবসা। যুদ্ধের বাজারে ছুঁচের ব্যবসা। কাপড়ের ব্যবসা। কাঁটা তারের ব্যবসা। জালের ব্যবসা।

তারপর আরও অনেকগুলো বছর নিরুদ্দেশ। বোম্বাই থেকে হায়দ্রাবাদ, নাগপুর। আরও টাকা। আরও টাকা। তারপর গাড়ি। বাংলো। তারপর কলকাতা।

সীতেশকে বরাবরই ভালবাসত সুধাকর। ভাল ছেলেকে ভাল লাগত না সুধাকরের। শুধু সীতেশকে ছাড়া। এসেই ওর সঙ্গে গল্প শুরু করত। রোজ আসত যে কদিন থাকত। কিন্তু চলে গেলে আর চিঠি দিত না।

সীতেশ মাঝে মাঝে ওকে বলত,—আচ্ছা মদটা তো ছেড়ে দিলেই পারিস!

—দুর! কি যে বলিস! এটা ছাড়া ওটা ধরা ওসব ঠিক ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে তো খাইও না।

সীতেশ হাসে,—একটা বিয়ে কর না। টাকা তো অনেক হলো।

—বিয়ে!—সুধাকর হাসে,—কটা করতে বলিস?

—একটাই কর।

—গোটা পনেরো করেছি। হায়দ্রাবাদেই চারটে। তার ভেতর একটা তো ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে!

সীতেশ হাঁ হয়ে যায়,—বলিস কিরে? বিয়ে!

—মানে, তোদের বিয়ে নয়, একসঙ্গে থাকা।

—তাদের ছাড়ালি কি করে?

—ভাল না লাগলেই ছেড়ে দিয়েছি।

সীতেশের ভাল লাগে না কথাটা।

তবু সুধাকরকে কিছু বলা বৃথা।

সুধাকর হাসে,—খুব খারাপ লাগছে শুনতে। নয়? কিন্তু একটা সত্যি কথা তোকে বলি ভাই, বিশ্বাস কর। মেয়েগুলোই সেধে এসেছে আমার সঙ্গে। আমার কোন দোষ ছিল না।

একটু থেমে বলে,—মেয়েরা সব কিছু করতে পারে—মানে টাকার জন্যে। টাকা ওদের বড় প্রিয় জিনিস। আমি নিজে দেখেছি! এই তো কলকাতার

এক মেয়ে হোস্টেলের সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট্ আমার বন্ধু। তার ওখান থেকেই তো দু তিনটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়। দু'জন বেরিয়ে আসে। আর একজন এলো না।

সীতেশ শুনতে শুনতে স্তম্ভিত হয়, বলে,—আর একজন তো এলো না! তবেই দেখ সব মেয়েই টাকা চায় না।

—ঠিক তা নয়।—সুধাকর গম্ভীর হয় একটু,—মানে একটু পাগলাটে ছিল মেয়েটা। বোম্বায়েও ওরকম দু' একটিকে দেখেছি। তারা বড়লোকের মেয়ে। তবু দেড় হাজার টাকার একছড়া নেকলেস্ দিলেই ঠাণ্ডা। যাক্! আজ চলি।

চলে গেছে আবার সুধাকর—এক বিস্ময়ের সাগরে ডুবিয়ে দিয়ে সীতেশকে।

আবার বছর দেড়েক পরে এসেছে।

এবার এ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ অপারেশন করতে।

সীতেশ শুধোয়—কি হোলরে। আবার এতবড় একটা রোগ নিয়ে এলি!

সুধাকর ম্লান হাসে,—হ্যাঁ, মরি তো তোর কাছেই মরি। আর সব শালার আমার টাকার ওপর নজর। হয়ত ইচ্ছে করেই মেরে দেবে। তুই তা করবি না।

সীতেশ হাসে,—কি করে জানলি! যাক্, হাসপাতালে কবে যাবি?

—কাল।

—আমার এক বন্ধু ডাক্তার আছে। তাকে দেখাই আগে।

সীতেশই সব বন্দোবস্ত করে।

অপারেশনের সময় সীতেশকে থাকতে হয়।

রোজ হাসপাতালে যেতে হয়। আড়াই হাজার টাকা নগদ সীতেশের হাতে দিয়ে রেখেছিলো সুধাকর। তাই থেকেই খরচ হয়।

সেরে ওঠবার পর বাকী টাকা ফেরত দিয়ে দেয় সীতেশ।

সুধাকর বলে—টাকাটা তোর কাছেই থাক না।

সীতেশ ঘোরতর আপত্তি জানায়,—না ভাই, আমরা গরীব। খরচ হয়ে যাবে।

সুধাকর হাসে,—তবে দে।

টাকাটা নিয়ে আবার বলে।

তারপর সীতেশের মেজদা ধীরেশের সঙ্গে মাধুরীর বিয়ে।

আরও অনেকদিন কাটে।

তারপর এই চিঠি।

চিঠিটা খোলে সীতেশ।

হাতের লেখাটা সুধাকরের এখনও খুব খারাপ।

লিখেছে,—মাস ছয়েক পর যাইবার ইচ্ছা আছে। এবার গিয়া তোদের বাড়ি উঠিব। মাধুরীর সম্পর্কে ভাই হিসাবে উঠিব। তোর বন্ধু হইয়া নয়। কুটুম বলিয়া আমার আদর বাড়িবে। —ইতি সুধাকর।

অদ্ভুত চিঠি। অদ্ভুত সুধাকর। শুয়ে পড়ে এবার সীতেশ। সুধাকরের কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়ে একসময়।

পরদিন বিকেলে শোভনাকে নিয়ে সীতেশ ওদের বাড়ি আসে। বৌদিরা সব জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল উৎসুক চোখে। ওরা বাড়ির দোরের কাছে আসতেই সবাই এগিয়ে আসে।

শোভনাকে নিয়ে বাড়ি ঢোকে সীতেশ।

স্বাভাবিক গাম্ভীর্য বজায় রেখে শুধোয় সুবর্ণকে—দাদা কই ?

সুবর্ণর আগেই মাধুরী ফিক্ করে হেসে জবাব দেয়—ওপরে।

হাসিটা লক্ষ্য করে শোভনা—সীতেশও।

লজ্জায় আরক্তিম হয়ে ওঠবার মেয়ে ঠিক শোভনা নয়।

বরং বিরক্ত হয় একটু।

এগোয় ওরা দুজন।

মাধুরীর খিল্‌খিল্ হাসিটাও শোনা যায় পেছন থেকে।

বীরেশের ঘরের সামনে এসে সীতেশ বলে—তুমি ভেতরে যাও।

শোভনা অবাক—বারে বা! তুমি এসো।

—আমার কি দরকার, তুমি যাও না। ওই তো দেখা যাচ্ছে বসে আছে দাদা জানালার বাইরে তাকিয়ে।

—তা কখনও হয়। পরিচয় নেই, চেনা নেই।

সীতেশকে শেষটায় বাধ্য হয়ে ঘরে ঢুকতেই হয়।'

বীরেশ বসে ছিল। ওরা ঢুকতেই উঠে দাঁড়ায়।

সীতেশ মুখটা প্রায় নীচু করেই বলে—এই যে দাদা। ইয়ে এসেছে।

ইয়ের সম্বন্ধে আগে থেকেই বীরেশ জানত। আর বেশী বলতে হয় না। বীরেশ হেসে শোভনার দিকে তাকিয়ে বলে,—বসুন।

শোভনা চৌকীর এক কোণে বসে তাকিয়েই দেখে সীতেশ অন্তর্ধান।

কথাটা শেষ পর্যন্ত শোভনাকেই পাড়তে চায়, কিন্তু কিছুতেই যেন এ লোকটির সামনে বলতে পারে না।

বীরেশের মুখের অত্যন্ত স্বাভাবিক চিন্তাশীল গাম্ভীর্যের কাছে ওর প্রগল্‌ভতা আর অকারণ চাঞ্চল্য যেন সংকুচিত হয়ে ওঠে।

শোভনা স্বভাব-চঞ্চলা। তবু আজ চৌকীর কোণে বসে শাড়ির একটা আঁচল আঙুলে জড়াতে থাকে।

বীরেশ বলে—সব শুনেছি আমি। আমাকে কিছু বলতে হবে না মা!

'মা' ডাকটা বড় সেকেলে। তবু এ লোকটার মুখে যেন বড় মধুর লাগে।

শোভনা বড় বড় চোখদুটো তুলে একবার তাকায় বীরেশের দিকে।

বীরেশ বলে, আবার মৃদু হেসে—আমার তো সৌভাগ্য মা। তুমি যদি এ ঘরে আসতে চাও, আমার আনন্দই হবে। তবু একটা কথা বলবার ছিল।

—বলুন। —তাকায় শোভনা।

—মানে, চিরকেলে কথা। গরীব বড়লোকের একঘেয়ে কথাই আবার বলতে হচ্ছে। এখানে এসে হয়ত তোমার কতকগুলো অভ্যেস ছাড়তে হবে। সেটা আমাদেরই আর্থিক অভাবের জন্মে।

—ঠিক বুঝলাম না। —বলে শোভনা।

বীরেশ একটু হাসে,—সকালে তুমি কি জলখাবার খাও?

শোভনা একটু ইতস্তত করলেও সত্যি কথাই বলে—একটা ডিম সেদ্ধ, দুটো টোস্ট, একটু মাখন, কোনদিন বা একটু চীস্, কোনদিন বা দুটো কেক, আর এককাপ চা।

বীরেশ বলে—আর এখানে এসে হয়ত এ অভ্যাস ছেড়ে তোমায় খেতে হবে একমুঠো মুড়ি এককাপ চা।

শোভনা হাসে। ওর ঝকঝকে দাঁতগুলো ভারি সুন্দর দেখায়,—মুড়ি খুব ভাল।

—তবে তো খুবই ভাল। বীরেশও খুব হাসে—আর আমার কি বলবার আছে!

চুপচাপ কিছুক্ষণ কাটে।

শোভনাই বলে অবশেষে—আজ তাহলে উঠি।

—আচ্ছা। একটা কথা। তোমার দাদার কাছে কি আমার যাবার দরকার আছে?

শোভনা নম্র স্বরে বলে—আপনি যা ভাল বোঝেন করবেন। গেলে দাদা খুশীই হবেন।

—তবে তাঁকে বোল, আমি কালই যাব। এ ব্যাপারে আর দেরি করতে চাইনে।

শোভনা ঘর থেকে বেরোয়।

সীতেশের সাড়াশব্দ পায় না কোথাও।

মুখ নীচু করে এগোতে গিয়ে শাড়িতে টান পড়ে। ফিরে দেখে সামনের ঘরের জানালা দিয়ে সীতেশ তাকে ডাকছে। —এ ঘরে এসো।

শোভনা ভ্রূভঙ্গি করে নিষেধ করে—না, বাইরে এসো।

সীতেশ বাইরে আসে।

রাস্তায় বেরিয়ে সীতেশ বলে,—ডাকলুম এলে না যে! ওটা তো আমার ঘর।

—তোমার কোন কাণ্ড-জ্ঞান নেই। তোমার ঘরে কি এখন আমি যেতে পারি?

—কেন, দোষ কি?

—তুমি বুঝবে না। বোকার মতো কথা বোল না!

সীতেশ অগত্যা কথা পাণ্টায়,—দাদাকে কেমন দেখলে?

—ভালই।

—মানে? তুমি তো জান না কত বছর জেলে ছিল?

শোভনা যেন বিরক্ত হয়,—জেলে চোর ডাকাতও অনেকদিন থাকে।

সীতেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়,—তাই বলে দাদার সঙ্গে তাদের তুলনা?

—তুলনা তো আমি দিচ্ছি নে। অনর্থক কেন কথা বাড়াচ্ছ?

সীতেশ চুপ করেই যায়।

শোভনার মনের নাগাল পাওয়া ভার।

আবার অন্য কথা পাড়তে হয় চলতে চলতে,—একটা ট্যাক্সি নোব?

—থাক। ট্রামেই যাওয়া যাবে।

সীতেশ আস্তে আস্তে বলে,—কি কথা হোল?

—তোমার তা শুনে কাজ নেই।

—তবু এ ব্যাপারে আমিও জড়িত। আমাকে শোনাতে বাধা কি!

—বাধা আছে। একা একা ফেলে যে পালায় তাকে কিছু বলা যায় না।

—পালালুম কই!—সীতেশের কানদুটো আরক্তিম হয়ে ওঠে।

শোভনা ওর দিকে না তাকিয়েই বলে,—তুমি যেতে পারো। আমি একাই যেতে পারব।

সীতেশ আর কথা বলে না, ওর সঙ্গে সঙ্গেই চলে।

শোভনা তাকায় ওর দিকে এতক্ষণে। হেসে ফেলে।

সীতেশও হাসে।

শোভনা সীতেশের একটা হাত ধরে এবার। বলে,—তুমি এবার চলো, আমার দাদাকে বলবে।

সীতেশ বলে,—না। ও আমার দ্বারা হবে না।

—কেন নয় শুনি।

—কি বলব ?

—বলবে, যা চাও তাই বলবে।

—সে কি করে বলা যায়।

শোভনা হাসে,—খুব সুপুরুষ ! বিয়ে করতে পারবে, আর বিয়ের কথা বলতে পারবে না !

সীতেশ একটু একটু হাসে শুধু। উত্তর দেয় না।

ট্রামের জন্য দাঁড়াতে হয় দুজনকে।

ট্রামে দুজন চুপচাপ।

শোভনাদের বাড়ির কাছে এসে সীতেশ চলে যেতে চায়।

শোভনা বলে,—তা হবে না। দাদাকে বলতে হবে।

—চলো, বলব।—একটু চটে এবার সীতেশ।

শোভনা বোঝে ও একটু চটেছে। বলে,—থাক্, আর বলতে হবে না। কাল দয়া করে সন্ধ্যেবেলা এসো। বিকেলে এসো না যেন। তোমার দাদা বিকেলে আসবেন।

—তবে কাল তো না এলেও হয়।—বলে সীতেশ।

শোভনা মুচকী হাসে,—একেবারে না এলেও হয় !

—আচ্ছা, চলি। কাল সন্ধ্যায় থেকো।

সীতেশ চলে আসে।

বাড়িতে ধীরেশ রাত্রে সব শুনে বীরেশকে শুধোয়,—দাদা, এ কেমন শুনছি ? কাল এসেছিলো সেধে বাড়ি বয়ে !

বীরেশ মৃদু হেসে বলে,—হ্যাঁরে এসেছিলো। বড় ভাল মেয়ে।

ধীরেশ একটু কড়াস্বরে বলে,—এ কেমন ভাল মেয়ে শুনি। বাবার জন্মে এ রকম শুনিনি ! মেয়েছেলে বাড়ি বয়ে আসে নিজের বিয়ের ঘটকালী করতে।

—তা নয় রে ! আমিও তো দেখতে চাইতে পারি ! মেয়েটি বড় লক্ষ্মী।

মাধুরী বলে,—দাদার আবার বাড়াবাড়ি। লক্ষ্মী না ছাই। কেমন রুক্ষু রুক্ষু চেহারা!

বীরেশ বলে,—না, মা। চেহারাটিত বেশ। সুশ্রী।

সুবর্ণ বলে,—মেয়েটিকে কিন্তু আমার ভালোই লেগেছে।

ধীরেশ ধমকে ওঠে,—তোমার তো সবই ভাল লাগে বৌদি! মায়ের মতো স্বভাব পেয়েছ!

মাধুরী বলে এতোক্ষণে,—তবে ঠাকুরপোর সঙ্গে মানাবে।

কি বলো দিদি? আচ্ছা বিয়ে কবে হবে দাদা?

ভাসুরকে মাধুরী বরাবর দাদা বলেই ডাকে।

—বিয়ে?—বীরেশ একটু ভেবে বলে,—আমার তো ইচ্ছে যত শিগগির হয়।

—তাহলে কিন্তু খুব মজা!—মাধুরী প্রায় নেচে ওঠে।

ধীরেশ তবু বেজার মুখ,—আমার কিন্তু ঠিক মানে খুব ইয়ে মনে হচ্ছে না। দাও ভাত দাও। সীতেশ কই?

—ঠাকুর পো কি আর এ মুখো হয়? ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে!

বীরেশ বলে,—ওকে ডাকত মা! রাত হয়েছে অনেক।

তিন ভাই খেতে বসে এক সঙ্গে। পরিবেশন করে সুবর্ণ।

পরিবেশনে বীরেশের বলা আছে সুবর্ণকে ধীরেশকে সব চেয়ে ভাল মাছ তরকারী সব চেয়ে বেশী দেবে। তারপর সীতেশকে, সব চেয়ে খারাপ জিনিস আর কম জিনিস দেবে বীরেশকে।

দু একদিন সুবর্ণ হয়ত ভুলে এর ব্যতিক্রম করে ফেলেছে।

ধীরেশ রেগে আগুন। দিন দশেক সুবর্ণর সঙ্গে কোন কথাই বলেনি। কাছে গেলে ধমকে উঠেছে। তারপর ক্ষমা চাইবার পর সুবর্ণর রেহাই।

মাধুরী সব দেখে বলে,—দাদার আবার বাড়াবাড়ি। একদিন একটু দিলেই বা। দেবেন তো দিদি। কাল আমি দেয়াথোয়া করব।

পরদিন হয়ত মাধুরী নিজে মাছ তরকারী দিতে গিয়ে ধীরেশ সীতেশকে কম দিয়ে দাদার পাতে সব চেয়ে বেশী দেয়।

বীরেশ মাধুরীকে আর কিই বা বলবে।

পাত থেকে তুলে ধীরেশকে দেয়, সীতেশকে দেয়।

মাধুরী জব্দ হয়ে রেগে যায়,—এ আপনার অন্যায় দাদা। ওরা তো রোজ খাচ্ছে। আপনি একদিন দুটো মাছ খান।

বীরেশ হাসে,—আমায় মা অনেক খাইয়েছে। ওরাই বরং খেতে পায়নি তেমন! ওদেরই বেশী দিও।

ধীরেশ ভারী খুশী।

সীতেশ খুশী হলেও মুখে একবার বলে,—আমায় আবার দেবার কি দরকার ছিল!

বীরেশ ধমক দেয়।—খা খা, বক্ বক্ করিসনে!

আজও ওরা তিন ভাই একসঙ্গেই খেতে বসেছে। পরিবেশন করছে সুবর্ণ। মাধুরী নুন জল দেয়া আর কথা বলা, গল্প করা, এই জন্যেই দাঁড়িয়ে আছে। বড় জোর সুবর্ণর ছেলে মেয়ে ঘুম থেকে উঠে কাঁদলে তাদের কোলে নিয়ে চুপ করাতে যায়।

খেতে খেতে কারো আর কোন কথা হয় না।

সকলের মনেই সীতেশের বিয়ের কথা, শোভনার কথা আনাগোনা করে।

সীতেশ তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে উঠে যায়।

এতক্ষণে বীরেশ শুধোয় ধীরেশকে,—তুই কি কাল যাবি একবার।

—কোথায়?

—ওই মেয়েটির দাদার কাছে। চ' আমার সঙ্গে। আমি যাব।

—আমার সময় হবে না দাদা। তুমি গেলেই হবে। তুমি যা ভাল বোঝ কর।

বীরেশ আর কথা বাড়ায় না।

রাত্রে সুবর্ণর সঙ্গে দু' চারটে কথা হয়।

সুবর্ণ শুধোয়,—বিয়ে কি এ মাসেই দেবে?

—ইচ্ছে আছে।

—কিন্তু শোবে কোথায়? ঘর তো তেমন—

—কেন সীতেশের ঘরে।—বলে বীরেশ।

—ওটা তো ছোট ঘর।—বলে সুবর্ণ।

বীরেশ একটু চিন্তা করে বলে,—তবে আমার ঘরটাই ছেড়ে দিতে হবে।

সুবর্ণ অবাক,—বারে বা! আমি ছেলেমেয়ে দুটা নিয়ে থাকব কোথায়? ওই ছোট ঘরে?

—হ্যাঁ।

—তা কি করে হয়। জায়গাই তো হবে না।

—না হয় তোমরা ঘরে থাকবে, আমি বারান্দায় শোব। তবু সীতেশকে বড ঘরটা না দিলে ওর বড় অসুবিধে হবে।

সুবর্ণ তার স্বামীকে চেনে। যা বলেছে, এর আর নড়চড় নেই।

তবু আর একবার বলে,—তার চেয়ে বাড়ীওলাকে বলে ছোট ঘরটা বাড়িয়ে বারান্দাটা অব্দি বাড়িয়ে নাও না?

—না। তাতে অনেক খরচা। বাড়ীওলা রাজী হবে কেন?

সুবর্ণ বোকা বনে যায়।

যত কষ্ট কি তাকেই করতে হবে!

বলতে গেলে বীরেশ বলবে,—হ্যাঁ, কষ্ট করতে হবে।

সুবর্ণ ঘাঁটায় না আর। শুধু বলে,—তার চেয়ে আমিই বারান্দায় শোব।

বীরেশ বোঝে সুবর্ণর এটা রাগের কথা।

বলে,—যদি ইচ্ছে হয় শুতে পারো।

সুবর্ণ কিছুক্ষণ পাথরের মতো চুপ করে থাকে, তারপর একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলে,—বিয়েতে পরবে ছেলেটার এমন জামাও তো নেই।

—ভাল জামা নেই?

—থাকবে কোত্থেকে? দিলে তো থাকবে!

বীরেশ এবার একটা নিশ্বাস ফেলে শুধু।

—বলতে ইচ্ছে হয় না, তবু না বলেও উপায় নেই। আমারও তো একখানা ভাল সাড়ী নেই যে বিয়েতে পরি।

বীরেশ হাসে এবার,—তোমার আবার বুড়ো বয়সে সাড়ী! আটপৌরে কাপড় তো আছে?

—আটপৌরে সাড়ী পরব বিয়েতে? আমার সখ আনন্দের বয়েসও গেছে!

বীরেশ বলে।—তা আর যায় নি! তুমিও কি কনে সাজবে?

সুবর্ণ আর কথা বলে না। বলে লাভ নেই। নিশ্বাসটাও চেপে যেতে হয়। এ মানুষের কাছে কিছু প্রকাশ করাও যা দেয়ালের কাছে বলাও তাই।

বীরেশও আর কথা বাড়ায় না।

কথা পাকাপাকি হয়ে যায়। প্রবীর সান্যাল ছ'হাজার টাকার গয়না সামগ্রী দিতে চায়। বীরেশ বলে যা পারেন দেবেন।

প্রবীর সান্যাল খুশী হয়ে বলে বসে—আরও দোব। যতটা সামর্থ্য ততটাই দেব। এই একটাই তো বোন।

বীরেশ হেসে চলে যায়। বলে যায়—কথা দিয়ে গেলাম। কিছু যদি নাও দেন তবু কথার নড়চড় হবে না।

বীরেশ চলে যায়।

শোভনা এসে প্রবীর সান্যালের ওপর ফেটে পড়ে—এক পয়সাও দিতে পারবে না তুমি আমার বিয়েতে।

প্রবীর হাসে। পাইপটা ধরায়,—কেনরে, কি হোল?

—না, বিয়ে তো তুমি দিচ্ছ না। বিয়ে কচ্ছি আমি।—বলে শোভনা।

প্রবীর সান্যালের ভ্রূদুটো কুঁচকে ওঠে,—আমার দেয়া জিনিস কিছুই নেবে না?

স্পষ্ট স্বরে বলে শোভনা,—না।

—আমার অপরাধটা শুনতে পাই কি?

—অপরাধ আমারই। নির্ভর করেছিলাম তোমার ওপর।

বলে বৌদি,—ঝাঁঝালো স্বরে,—দাদার সঙ্গে কথা বলবার শিক্ষাও পাওনি!

শোভনা বলে তিক্ত কণ্ঠে,—শিক্ষা তো দাদারই।

প্রবীর সান্যালের মুখটা কালো হয়ে ওঠে,—তোমার আজকের ব্যবহার আগের ব্যবহারের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে।

—সেটাও তোমারই জন্যে। এ বিয়েও করছি তোমারই জন্যে।—যেন দাদার ওপর তীব্র অভিমান নিয়ে বলে শোভনা।

প্রবীর যেন এতক্ষণে কিছুটা আভাস পায় সব ব্যাপারের।

গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে বলে আস্তে আস্তে,—সীতেশ—তোমার অযোগ্য নয়, একথা আমি এখনও মনে করি।

শোভনার গলা কাঁপে,—তোমার মনে করাটা ভারি ভাল লেগেছে আমার। আমার ওপর তোমার কত বিরাট ধারণা! শুনে সত্যিই এত ভাল লাগল। তাই তো ভেবেছি সীতেশই আমার যোগ্য। আর সবাইকেই ত্যাগ কোরব সীতেশকে গ্রহণ করে।

—আমাকেও।—ম্লান হাসে প্রবীর।

—হ্যাঁ।

প্রবীর শান্তস্বরে বলে,—তবু বলব, সীতেশ তোমাকে মানুষ করে তুলবে। তুমি সুখী হবে। আর—প্রবীর সান্যাল গভীর স্বরে বলে, ঐশ্বর্য ছাড়া সুখ! আমরা যেন ভাবতেও পারি না। তাই নয়?

শোভনা দাদার গলার স্বরে অবাক হয় একটু। কথা বলে না।

প্রবীর সান্যাল ওঠে। বেরুবে এবার। বাইরে। ফিরবে হয়ত রাত দুটায়। মত্ত হয়ে। রক্তো প্রেরণায় উন্মত্ত হয়ে। ঝলমলে আলোর নীচে বসে টাকার খেলায় মেতে উঠবে। হারবে আবার জিতবে। বারবার বুক জ্বালাতে চুমুক দেবে কোহলের পেয়ালায়। কাঁচের পেয়ালাটা ছুঁড়ে ফেলেই দেবে হয়ত বা মোজায়েক মেজের ওপর। চমকে ঝলমলিয়ে উঠবে জড়োয়া জড়ানো তন্বী রূপসী এক। মদালসা রূপসীর কণ্ঠলগ্না হয়ে থাকতে দেখা যাবে প্রবীর সান্যালকে অনেক রাত। অথবা কোন আই, সি, এস, গৃহিনীর ঠোঁটের রঙের ঝিকিমিকিতে বুঁদ হয়ে যাবে প্রবীর সান্যাল। তখন কোথায় বা শোভনা আর কোথায় বা সংসার।

প্রবীর সান্যাল ওঠে—তাই হবে। তোমার বিয়ে তুমিই করো।

চলে যায় প্রবীর সান্যাল।

বিয়ে হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে কিছু খরচ করতেই হয় প্রবীরকে। কিন্তু শোভনা কিছুই নেয় না। একখানা সাড়ীও নয়। সীতেশকে প্রবীর গৃহিনী ঘড়ি, আংটি বোতাম সুটকেশ জামা ইত্যাদি দেয়। তাতে শোভনা আর আপত্তি জানায় না।

কিন্তু শোভনার বিয়ে করবার নোতুন সাড়ীখানাও সীতেশের কাছ থেকেই বলে কিনিয়ে আনে শোভনা। দাদার দেয়া কিছুই সে নেবে না।

সীতেশ মনে মনে একটু বিরক্ত হলেও মুখে কিছু বলে না।

বিয়ে হয়ে যায়।

বীরেশ শোভনাকে নিতে আসে বিয়ের পরদিন।

সীতেশ ওঠে। শোভনাও ওঠে।

মেয়েদের বরণ হবার পর শোভনা বৌদিকে প্রণাম করে।

বৌদিও আশীর্বাদ করে আজ। মুখটা ফিরিয়ে নেয়।

শোভনা শুধোয়,—দাদা কই ?

বৌদির বিচলিত স্বর শোনা যায়,—বাইরের ঘরে দোর বন্ধ করে—

ওরা বেরিয়ে আসে।

বাইরের ঘরের সামনে এসে শোভনা দাঁড়ায় একটু।

দোরে হাত দিতে যায়। কিন্তু আবার হাত ফিরিয়ে আনে।

আর আসবে না শোভনা। আর আসবে না।

তবুও দাদা কি একবার তাকে দেখতে বেরুতে পারে না।

শোভনা মুখটা নীচু করে।

টপ্ টপ্ করে ওর গাল বেয়ে জল ঝরে পড়ে চৌকাঠের ওপর।

ফিরে দাঁড়ায় শোভনা।

সীতেশ পাশে ছিল। বলে, কই দাদার ঘরে গেলে না।

শোভনা কথা বলতে পারে না। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে স্বর বেরোবে না।

ওরা গিয়ে গাড়িতে ওঠে।

দেখতে পায় না ওরা—লক্ষ্যও করে না কেউ যে জানালার পাশে আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রবীর সান্যাল নির্নিমেষ নয়নে দেখছে ছোট বোনটিকে।—আর ছোট রুমালটা দিয়ে চশমার নীচে চোখ মুছচে বার বার।

বীরেশের আজ আনন্দ আর ধরে না। সীতেশের বউ এসেছে ঘরে। সুবর্ণকে বলছে চুপি চুপি,—মাঝে মাঝে শুধিয়ো বৌমার খিদে পেয়েছে কি না! খিদে পেলে একটু দুধ মিষ্টি খেতে দেবে। চোখ মুখ যেন বসে গেছে মেয়েটার।

সুবর্ণ আঁচলটা পিঠের ওপর তুলে বলে,—তোমাকে আর শেখাতে হবে না আমায়।

সুবর্ণ পরেছে একখানি নোতুন সাড়ী। কিনে দিয়েছে ধীরেশ। বীরেশ নয়।

বিয়ের দিন ময়লা পুরোনো সাড়ীটা পরে থাকতে দেখে আর তার পাশে মাধুরীকে অপরূপ সজ্জায় সাজতে দেখে শুধিয়েছিলো—ভাল সাড়ী নেই বৌদি!

সুবর্ণ হেসে বলেছিলো,—ভাল সাড়ী আবার কি হবে ভাই।

ধীরেশ ব্যস্তবাগীশ মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে দোকানে গিয়ে সাড়ে পনেরো টাকায় সাড়ী কিনে নিয়ে এলো। সুবর্ণকে দিয়ে বললে,—যাও পরো। নোতুন বউ আসবে, কি ভাববে সে?

সুবর্ণর মুখ হাসিতে ভরে ওঠে।

বীরেশ বৌকে তো কিছু দিতেই পারে না। উপরন্তু তাকে ধারই করতে হয়।

বিয়েতে প্রবীর তো কিছু দিলে না। জমানো টাকাও নেই।

কাজেই অফিস থেকে তিনশ টাকা ধার করে আনতে হয় বীরেশকে। কোনমতে বৌভাত সারতে হবে তো?

ধীরেশের কাছে একবার চেয়েছিলো। ধীরেশ স্পষ্ট বলেছিলো তার কাছে একপয়সাও নেই। কারণ হয়ত বা এ বিয়েতে ধীরেশের বিশেষ মত ছিল না।

সীতেশের কাছে চাওয়া সম্ভব নয়।

বহু চিন্তার পর বীরেশ স্থির করে যে ধার করেই এ খরচ তাকে চালাতে হবে।

কেউ জানে না এ কথা।

সুবর্ণও নয়।

সীতেশের বিয়েতে কিছু খরচ না করলে তার দুঃখের আর পরিসীমা থাকবে না। সামান্য মাইনের চাকুরে বীরেশ তাই এত বড় দায়িত্ব নিতেও ভয় পায় নি। প্রত্যেক মাসে মাইনে থেকে টাকা কেটে নেবে। তা নিক।

নিজে না হয় কিছুটা কষ্টই করবে বীরেশ।

ভবিষ্যতের চিন্তা বীরেশ করে না। ভাইরা তো রয়েছে। সীতেশ তাকে দেখবে নিশ্চয়ই।

সামান্য টাকাতে বীরেশ বৌভাতে বিশেষ কিছু করে উঠতে পারে না।

ধীরেশ শোভনাকে দেখেশুনে খুশীই হয়। দুশ আটাশ টাকায় একটি হার কিনে দেয় শোভনাকে।

—এইটি পরো বৌমা।

শোভনা মনে মনে খুশীই হয়। ধীরেশকে ওর বেশ ভাল লাগে।

কথায় কথায় ধীরেশের সঙ্গে ওর আলাপ জমে ওঠে।

এ কথাও ধীরেশ জানায়। সংসারটার সব খরচই সে দেয়। দাদা কিছুই করে না।

শোভনা শুধোয়,—দাদা তো দেশের কাজ করেই জীবন কাটালো।

—তা বটে!—বলে ধীরেশ,—কিন্তু বুড়ো মা ছোট ভাইদের না দেখে দেশের কাজ করা, এ কেমন কথা আমি বুঝি না।

শোভনা হাসে।

—আচ্ছা মেজদা, আপনি বুঝি মেয়েদের পড়াশুনো পছন্দ করেন না।

ধীরেশ বলে,—তা কেন? লেখাপড়া শেখা তো ভালই।

—তবে মেজদিকে শেখালেই তো পারেন!

—আমার আর সময় কই বলো! তুমিই না হয় শেখাও না।

মাধুরী হেসে বলে,—ও যে মাষ্টারী করবে, ওকে কি দেবে শুনি!

ধীরেশ হাসে,—ও তো তোমার মতো দাসী নয় যে মাইনে দিতে হবে। ও যে ছোট বোন।

মাধুরী ফোঁস করে ওঠে,—শুনলে ভাই, আমি ওর দাসী!

বীরেশ ঘরে ঢোকে।

বীরেশকে দেখায় হারছড়া,—শোভনা,—এইটে মেজদা দিলে!

বীরেশের মুখটা গম্ভীর হয়ে ওঠে—বেশ হয়েছে!

ধীরেশের দিকে তাকিয়ে দেখে বীরেশ।

ধীরেশ তাকে বলেছিলো তার কাছে একটা পয়সাও নেই। তবে কি ধার করে হারছড়া দিলে!

শোভনা বীরেশের ম্লান মুখের চাউনী লক্ষ্য করে।

কেউ কিছু বলে না।

বীরেশ শুধোয়,—তুমি কি দাদার ওখানে যেতে চাও?

শোভনা মুখ নীচু করে বলে,—না।

বীরেশ গম্ভীর স্বরে বলে,—আমার মনে হয় একবার যাওয়া উচিত। তাছাড়া বিয়ের পর একবার ঘুরে আসবার নিয়মও রয়েছে।

শোভনা চুপ করে থাকে।

—তোমার দাদা লোক পাঠিয়েছে। কাল আসতে বলব।

শোভনা মুখ নীচু করেই বলে,—দাদার ওখানে যাবার ইচ্ছে আমার নেই।

বীরেশ তবু বলে,—একবার গেলে ভাল হোত।

ধীরেশ বলে ওঠে,—না হয় নাই গেলো! ওঁর দাদাও তো ব্যাভার ভাল করে নি?

বীরেশ ধমক দেয় ধীরেশকে,—চুপ কর তুই। ব্যবহার তিনি একটুও খারাপ করেন নি। অতি ভদ্র মানুষ তিনি। যদি তিনি বলে থাকেন, করে থাকেন, ছোট বৌমার ভালর জন্যেই তিনি করেছেন।

সীতেশ ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সব শোনে।

ঘরে ঢোকে না।

শোভনা মুখটা তুলে ভ্রূ দুটো কুঁচকে হঠাৎ বলে,—এ সব আলোচনা আমার ভাল লাগছে না।

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মাধুরী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ধীরেশ বলে,—হোল তো। তখুনি দাদাকে বললুম!

বীরেশ ধীরেশের দিকে তাকায়। তারপর একটু ম্লান হেসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে!

ধীরেশকে বলে,—হারটা তুই না দিলেই পারতিস? বৌ ভাতের খরচার টাকাই তো' কম পড়বে!

ধীরেশ হঠাৎ চটে যায়,—তাই বলে আমার সখ হলে একটা কিছু দিতেও পারব না! কি এমন কিনে রেখেছ আমাকে তোমরা!

বীরেশ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

আর একটা কথাও বলে না।

আরও একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুধু।

ফুল শয্যার রাত্রি ঘনিয়ে আসে। বৌ ভাত মিটে যায়। নতুন বিছানায় অনেক ফুল ছড়ানো। শয্যা আর রাত্রি মিলে যেন প্রতীক্ষা করছে নোতুন মধুর গোপন আলাপের।

ওরা ঘরে ঢোকে।

মাধুরী জানালার ধারে আড়ি পাতে।

সুবর্ণ একটু হেসে চলে যায়।

সীতেশ গিয়ে বিছানায় বসে।

শোভনা ফিরে সীতেশের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে দোরটা বন্ধ করে।

মাধুরীর খিল্ খিল্ হাসির শব্দ শোনা যায়।

মাগো! কনে দোর বন্ধ করছে।

তারা তো কখনও দেখেও নি শোনেও নি বিয়ের কনেকে দোর বন্ধ করতে।

মাধুরী ছুটে যায় সুবর্ণর কাছে ভাঁড়ারে,—দিদি গো!

হেসে লুটোপুটি।

—শোভনা নিজে দোরে খিল দিলে!

বলিস কিরে!—সুবর্ণও হাসে।

অনেক বছর আগে এদের ফুলশয্যার মধুর রাতের সব কটি মুহূর্ত ওদের মনের ওপর ভেসে ওঠে।

মনটা কেমন কেঁপে কেঁপে ওঠে দুজনেরই।

মাধুরী আবার ছোটে,—যাই দেখি কি করে? আলো কে নিভোয়।

ততক্ষণে দোর বন্ধ হয়ে আলো নিভে গেছে।

মাধুরী দোরের কাঠের ওপর কান পাতে।

সীতেশ ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে—আলোটা জ্বালো।

—না।—শোভনার স্বর শোনা যায় কি না যায়।

সীতেশ সিগারেট ধরায় একটা।

দেশলাইয়ের আলোয় শোভনার চন্দনের ফোঁটা পরা মুখখানা দেখে একবার।

ভাল করে দেখে চোখদুটোর সলজ্জ চাহনি।

আর রাঙা বেনারসী জড়ানো ফুলেভরা ওর নিটোল দেহটি।

দেশলাইয়ের আলোটা নিভিয়ে দেয় শোভনা ফুঁ দিয়ে।

সীতেশ হাসে।

সিগারেট টানে জোরে।

সিগারেটের আলোয় দেখা যায় শোভনা হাত বাড়িয়ে ধরে সীতেশের হাতখানা।

—একটা কথা রাখবে?

—কি?

—বলো রাখবে। —শোভনার গলাটা কাঁপে।

—রাখব। বলো। —সীতেশ সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে বলে।

শোভনার গলা ধরে আসে,—তোমার দাদাকে বলে দেবে আমার দাদার সম্বন্ধে কোন কথা যেন না বলেন।

সীতেশের ভ্রূদুটো একটু কোঁচকায়—কেন, কি হোল?

—কিছু নয়।   তার উপদেশগুলো এ ব্যাপারে কোন কাজে আসবে না।

—কিন্তু দাদা তো কখনও অন্যায় বলে না।

—আমি তো বলিনি অন্যায় বলেছেন।

—তবে ?

—আমি বাপের বাড়ি সম্বন্ধে কোন কথা শুনব না।

সীতেশ চুপ করে থাকে।

সিগারেটটা টানতে থাকে অনবরত।

ফুলশয্যার মধুযামিনীতে তার প্রথম আলাপ বড়ই বেদনার।

—আর একটা কথা ছিল।

—বলো ?

—আগে বলো, কথা রাখবে ?

সীতেশ কিছুক্ষণ ভেবে বলে,—রাখব।

—পাঁচ বছর তুমি আমাকে ছোঁবে না।

সীতেশ স্তব্ধ হয়ে যায়।

ঘরের অন্ধকারটা থিতিয়ে যেন জমাট হয়ে ওঠে ওদের চারদিকে।

সিগারেটটা চেপে—খুব জোরে চেপে নিভিয়ে ফেলে সীতেশ।

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

এক গেলাস জল পেলে বড় ভাল হোত।

—কথা বলছ না তো ?—শোভনার প্রশ্নটা যেন বিভীষিকার মতো শোনায়।

ধীরে ধীরে আর একটা সিগারেট ধরায়।

দেশলাইয়ের আলোয় দেখতে পায় শোভনার চোখ ভিজে।

বলে খুব ধীরে ধীরে,—পাঁচ বছর পরে ?

—পাঁচ বছর পরে কি হবে আমি জানি না।

সীতেশ চুপ করে থাকে।

শুধোয়,—কারণটাও বলবে না ?

—কারণ ?

—হ্যাঁ।

—শুনে কি লাভ ?

—লোকসান তো হোল। কিছু না হয় আরও হোক।

—পাঁচটা বছর সময় ভিক্ষে নিচ্ছি তোমার কাছ থেকে।—আবার কাঁপে শোভনার গলা।

—ভিক্ষে দিলাম। কিন্তু এমন একটা ভিক্ষে চাইবার কারণটা জানতে বড় লোভ হয়।

—কারণ ? শুনবে ?

—হ্যাঁ।

—শুনে সইতে পারবে ?

—চেষ্টা কোরব।

শোভনার রুদ্ধ স্বর। বলে,—তোমাকে তো আমি ভালবাসি না।

সিগারেটটা কাঁপে সীতেশের হাতে। কান দুটোয় জ্বালা ধরে।

আবার কিছুক্ষণ নিষ্ঠুর অন্ধকারের নিষ্পেষন। কঠোর নীরবতার নিদারুণ বোবা ব্যথা।

তোমাকে ভালবাসি না।

কথাটা শুনতে ভারি অদ্ভুত। অপূর্ব।

সীতেশ সিগারেটটা আবার চেপে নেভায়। এবার খুব জোরে।

কথা বলে না। গলার স্বরে মনের আবেগ প্রকাশ পায় যদি।

—ভাবছ তবে বিয়েব দরকার কি ছিল ?—বলে লাভ নাই।

আবার বলে,—দরকার ছিল দাদার জন্যে।

—দাদার জন্যে ? বিয়ে ?—বিস্ময়ের চরম আভাস সীতেশের কণ্ঠে।

—হ্যাঁ। দাদার জন্যে। আর কিছু জানতে চেয়ো না।—পাঁচ বছর সময় দাও আমায়।

কেন ?—সীতেশের কণ্ঠ এবার দৃঢ়।

—তাও শুনবে ?

—হ্যাঁ, শুনতে চাই।

শোভনার কান্নার শব্দ আসে কানে।

একটু পরে বলে শোভনা নিতান্ত অনুনয়ের স্বরে—চেষ্টা কোরব এই পাঁচ বছরে যদি তোমায় ভালবাসতে পারি। যদি পারি, তবে আমার আর কিছুই বলবার থাকবে না। যদি না পারি—

—যদি না পারো?

আশংকায় হতাশায় গলা কাঁপে শোভনার—যদি না পারি ফিরে যাব দাদার কাছে।

—ফিরে যাবে?

—হ্যাঁ। আর আসব না। কখনও না।

সীতেশের বুকের ভিতর দপ্‌দপ্‌ করে। হাত পায়ের তালু ঘামে। ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

—আমার কথা রাখবে না?

—*এখন যদি বলি রাখব না।*

শোভনার হাতদুটো ধরে সীতেশ অকস্মাৎ নিজের দিকে টানে।

শোভনা বিবর্ণ হয়ে ওঠে,—কথা যদি না রাখো, তবে আমাকে পাবে না।

—তোমাকে জোর করে পাব।

—জোর করে মন পাওয়া যায় না। —গা এলিয়ে দেয় শোভনা সীতেশের হাতের ওপর।

সীতেশ হাত ছেড়ে দিয়ে সরে আসে।

ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ে। ঘেমে ওঠে সর্বাংগ যেন কতদূর থেকে দৌড়োতে দৌড়োতে এসেছে।

শোভনা এবার একটু হাসে। বোধহয় মনে মনে।

সীতেশের চোখ দুটো ভেঙে আসে।

শরীরের আর কোন বল নেই যেন।

চোখ বুজে পড়ে থাকে সীতেশ।

শোভনা বিছানায় বসে থাকে কিছুক্ষণ।

চোখ দুটো ওর জ্বলে।

পাশ বালিশটা নিয়ে শুয়ে পড়ে অনেক পরে। রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে।

শোভনার যখন ঘুম ভাঙে তখন বেলা সাতটা।

পাশ ফিরে দেখে সীতেশ ঘরে নেই।

দোরের খিল খোলা—পাটদুটো ভেজানো।

চোখ কচলে উঠে বসে শোভনা।

দিনগুলো বিষাক্ত হয়ে উঠছে সীতেশের কাছে। তবু শোভনার চোখের সামনে কথায়-বার্তায় নুয়ে পড়ে যেন সীতেশ। নিজের মনের কথাটাও ভাল করে বলতে ভয় পায় যেন।

নিজেই অনেকবার বুঝে উঠতে পারে না কেন এমন হয়। কেন সে শোভনার একটা কথারও প্রতিবাদ করতে পারে না। একবার ভাল করে শোভনার চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারে না।

ভাবলে নিজেরই বিস্ময় লাগে।

শোভনা তাকে ভালবাসে না। এক অপরূপ অভিনয় করেছে মাত্র।

এ যেন ভাবতেও নিজের মুখটা লুকোতে ইচ্ছে হয় ওর।

তবে সে কি তেমন পুরুষ নয়, যাকে কোন মেয়ে ভালবাসতে পারে।

তবু এক ক্ষীণ আশার সঞ্চার।

হয়ত এই পাঁচ বছর তার প্রতি মুহূর্তের ব্যবহারে প্রতি মুহূর্তের পরিচয়ে শোভনা তাকে বুঝতে পারবে। তাকে জানতে পারবে এক অনন্য পুরুষ বলে, তাকে ভালবাসতে পারবে।

এক অহেতুক সাবধানতা এসে মনকে গ্রাস করে বসে।

শোভনার সঙ্গে প্রতি কথায় প্রতিটি ব্যবহারে ও অতিরিক্ত সাবধান।

প্রথম প্রথম সীতেশের পরিবর্তনটা শোভনার মনে বিস্ময় জাগায়। তারপর ও যেন সীতেশের মনের দুর্বল জায়গাটা ধরে ফেলে। মনে মনে হাসে। অজস্র হাসে। বেচারী সীতেশ!

খিল খিল করে হাসতে হাসতে এসে বলে—শুনছ, নার্সারী থেকে আজ টাকা পাঁচেক ফুল নিয়ে এসো।

সীতেশ প্রথমটা একটু চমকে যায়।

টাকা তার কাছে নেই। আর হঠাৎ ফুলেরই বা কি দরকার পড়ল।

একটু ইতস্তত করে বলে সীতেশ খুব শান্ত ভাবে একটু হেসে—ফুল কি হবে?

—তোমার কি দরকার? পাঁচ টাকার ফুল আমার চাই। কিছু মনে থাকে না।

—কি আবার মনে থাকবে?

—মেজদির বিয়ের তারিখ কাল। একটু ফুল দিতে হবে না।

সীতেশ পকেটে হাত দেয়,—কিন্তু এর আগে তো কখনও—।

শোভনা বিরক্ত হয়—এর আগে যা হোক। এর আগেত আমি আসিনি. একটু যদি বুদ্ধি থাকে তোমার! এনো কিন্তু। গোটা চব্বিশ কাঁটালী চাপা এনো।

সীতেশ ঘাড় নাড়ে,—আচ্ছা।

বেরিয়ে যায় স্কুলে।

শরীরটা কেমন করতে থাকে ওর। কেমন বমি-বমি লাগে।

এক টাকাও নেই। সবই খরচ হয়ে গেছে। দেখা যাক, যদি কোন মাস্টার বন্ধুর কাছে ধার-টার পাওয়া যায়।

শোভনা মনে মনে পুলকিত হয় ভেবে মাধুরীকে আজ অবাক করে দেবে।

মাধুরীর সঙ্গেই শোভনার মিল বেশী।

হয়ত শোভনা বললে মাধুরীকে,—চলো না মেজদি আজ সিনেমা যাই।

—সিনেমা! তোমার মেজদা আসুক। তাকে বলি।

শোভনা প্রথমটা অবাক হয়। তারপর হেসে গড়িয়ে পড়ে।

—এর জন্যে আবার মেজদাকে বলতে হবে।

মাধুরী একটু সোজা মানুষ, একটু বা গেঁয়ো।

শোভনার কথাটা ঠিক বোঝে না।

বলে,—তবে যাব কি করে?

—কেন, আমি আর তুমি।

—একা একা তুমি আর আমি।

শোভনা আবার হাসে,—আমরা তো দুজন হলুম। একা কোথায়?

—কিন্তু—। তবু ইতস্তত করে মাধুরী। কান দুটো ওর রাঙা হয়ে ওঠে শোভনার হাসিতে।

সুবর্ণ কথাগুলো শুনতে পায়। সুবর্ণর বুদ্ধি মাধুরীর চেয়ে তীক্ষ্ণ।

ও কিছুটা বোঝে, বলে শোভনাকে,—তা' ওর যদি ভাই পুরুষ মানুষ ছাড়া যাওয়া অভ্যেস না থাকে। তাই বলে তুই অত ঠাট্টা করবি!

সুবর্ণ শোভনাকে তুই বলে ডাকে। এটাও শোভনা পছন্দ করে না।

শোভনার ভ্রূদুটো কুঁচকে ওঠে, বলে,—তুমি যদি এখন বুড়ী সেজে থাকতে ভালবাস বড়দি। তা বলে মেজদিকে তো বুড়ী সাজিয়ে রাখা চলবে না।

সুবর্ণ ম্লান হাসে,—ময়লা আঁচলটা কাঁধে ফেলে বলে—রাগ করছিস কেন ভাই। তুই না হয় ওকে অভ্যেস করিয়ে নে।

—সেটা তুমি না বললেও করাব। চল মেজদি। দেরী হয়ে যাবে।

মাধুরীর গলাটা ধরে আসে,—কিন্তু আমার কাছে যে পয়সা নেই!

শোভনা গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে—চলো, আমার কাছে আছে।

সুবর্ণ আর একবার বলে,—আজ না হয় যাওয়া থাক না শোভনা। কাল যাস।

শোভনা নিদারুণ বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলে,—না, আজই যাব।

মাধুরী একবার বলে শোভনার কাণের কাছে ফিস্ ফিস্ করে,—দিদিকেও একবার যেতে বলোনা।

তেমনি আস্তেই জবাব দেয় শোভনা,—না।

কি জানি কেন এই অতি রোগা কালো কুৎসিত সুবর্ণকে প্রথমদিন থেকেই শোভনা খুব ভাল চোখে দেখতে পারে না। আর কি নোংরা!

একটু পরিষ্কার থাকতেও কি পারে না। ও একরকম বদস্বভাব।

পারতপক্ষে সুবর্ণর সঙ্গে কথাও বলে না শোভনা। সুবর্ণ দুএকটা কথা বলতে এলে ভালমুখে জবাব দিতে ও পারে না। গায়ে ওর জ্বালা ধরে।

বাঁকা উত্তর দিতেই হয়।

সুবর্ণ যে বোঝে না তা নয়। মুখটা শুকিয়ে ওঠে ওর। রক্তাভাশূন্য সাদা চোখ দুটো কেমন যেন আরও জোলো হয়ে ওঠে।

শোভনা দেখেও দেখে না।

মাধুবীর ঘরে গিয়ে আলাপ করতে সুরু করে। মাধুবীকে ওর ভারি ভাললাগে। কেমন পরিচ্ছন্ন সুন্দর! কি সুন্দর মুখের গড়ন। কেমন হাসিখুসী চোখদুটি যেন হাসিতে নাচছে।

সীতেশকে পেলেই ক্ষেপাতে সুরু করে দেয়।

ভারী ভাললাগে শোভনার মাধুবীর লুটিয়ে পড়া হাসি।

অবশ্য এটা ও বুঝতে না পারে তা নয় যে মাধুবী খুব চতুর নয়।

খুব চতুর হওয়া কি ভাল? কখনই নয়। একটু সরল সুন্দর ভাল মানুষ পছন্দ করে শোভনা।

ওকে নিয়ে একা সিনেমায় যায়। একা বেড়াতে বেরোয়।

—চলো মেজদি বেড়াতে যাই?

—কোথায় ভাই। ছোট ঠাকুরপো'র ইস্কুলে?

—দুর! চলো না। যেখানে হোক। বাড়িতে ভাল লাগছে না।

সুবর্ণ ছেলে নিয়ে বসেছিলো।

খোকা সুবর্ণর কোল থেকেই বলে,—আমি যাব।

মাধুবী বলে,—যাবি তো জামা প্যাণ্টুল পরে নে না, হাবা ছেলে!

সুবর্ণ উঠতে যায় ওকে-জামা প্যাণ্ট পরাতে।

শোভনা হঠাৎ বলে,—না, কোথায় হারিয়ে-টারিয়ে যাবে! ও বরং থাক।

—আমি হাত ধরে নিয়ে যাব।—বলে মাধুবী।

শোভনা বলে একটু হেসে,—হ্যাঁ, তোমায় হাত ধরে নিয়ে যেতে হবে আমায়। তুমি আবার ওর হাত ধরবে।

খোকা একটু নাকে কাঁদে—আমি যাব।

শোভনা দেখেও দেখে না।

সুবর্ণ ছেলের গালে একটা চড় বসায়,—চুপ কর অসভ্য ছেলে।

শোভনা টেরিয়ে তাকায় মাধুরীর দিকে। চোখটিপে হাসে।

মাধুরীও হাসে। অনেকটা ওর দেখাদেখি।

সেজেগুজে দুজনে বেরিয়ে যায়।

সুবর্ণ ছেলেকে দুটো ভাত খাইয়ে সীতেশের ঘরে পাঠিয়ে দেয়। সীতেশ খোকাকে বড ভালবাসে।

সীতেশ তখন ইস্কুল থেকে ফিরে শুনেছে শোভনা বেড়াতে বেরিয়েছে।

সুবর্ণ উনুনে আঁচ দিতে যায়।

কি জানি কেন ওর বুকটা কেমন করে।

অনেকগুলো দীর্ঘ নিশ্বাস ওকে চেপে থাকতে হয়।

রান্নার জোগাড় করে।

দু'বেলা রান্নার কাজ সবই সুবর্ণকেই করতে হয়। মাধুরী সামান্য কিছু কিছু হয়ত বা করে।

শোভনা তো নোতুন বৌ!

উনুনের কয়লার ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে। চোখদুটো বারেবারে মুছতে হয় ওকে।

খোকা গিয়ে সীতেশের কাছে নালিশ জানায়,—আমাকে নিলে না।

—তাই নাকি!—সীতেশ জামা খোলে। ওকে কোলে নিয়ে ওর হাতে চারটে পয়সা দেয়। বলে,—লবেঞ্চুস খাবি। বুঝলি?

ঘাড় নাড়ে খোকা।

আবার সেই একই নালিশ জানায়,—আমাকে নিয়ে গেল না।

—আচ্ছা, আমি একদিন নিয়ে যাব তোমায়।—সীতেশ বলে ওকে সান্ত্বনা দিয়ে।

শুধোয়,—কোথায় গেছেরে ওরা জানিস?

—বেড়াতে।

—কোথায় ?

—জানি না।

সীতেশ একখানা বই খুলে বসে।

কিছু পরে সুবর্ণ খাবার নিয়ে ঘরে ঢোকে।

দু'খানা পরোটা একটু তরকারী।

—খেয়ে নাও ছোটঠাকুরপো !

—হ্যাঁ, নিই।—বলে সীতেশ বই রাখে।

গ্লাসের জলে হাতটা ধুয়ে খেতে সুরু করে। আধখানা পরোটা ছিঁড়ে দেয় খোকাকে।

সুবর্ণকে শুধোয়,— ওরা কোথায় গেছে বৌদি ? জান ?

—বেড়াতে !

—কোথায় ?

কোথায় তা তো বলেনি।

সীতেশ সুবর্ণর পাংশু মুখখানা লক্ষ্য করে।

সাড়ীটা লক্ষ্য করে। হলুদের দাগ জায়গায় জায়গায়। চোখের কোলটা ভেতরে ঢুকে গেছে। সাদা ফ্যাকাসে চোখদুটো যেন নিষ্প্রভ ক্লান্ত।

—তোমার কি খাটুনী খুবই বেশী পড়ে বৌদি ?

সুবর্ণ হাসে। চোখদুটো ওর হাসতে গিয়ে চিক্ চিক্ করে জলের আভাসে। বলে,—না, তেমন আর কি ? মেয়ে হয়ে জন্মেছি, এটুকু খাটুনীকে ভয় করলে কি চলে ভাই।

সীতেশ তাকায় সুবর্ণর দিকে। মেয়ে হয়ে তো শোভনাও জন্মেছে। কিন্তু শোভনার সঙ্গে বৌদির তুলনাটা কোন মূর্খের খেয়াল বলেই মনে হয় যেন।

বলে,—তা বটে !

একটা নিশ্বাস চাপে সীতেশও।

সুবর্ণও লক্ষ্য করে সীতেশের ম্লান মুখে পাণ্ডুর ঠোঁট দুটোয় হাসি নেই। আগের সীতেশ যেন কিছুদিনেই পরিবর্তিত হ'য়ে গেছে।

বলে,—তোমার শরীরটাও ভাল দেখছিনে ভাই।

—না ভালই আছি!—একটু হাসবার চেষ্টা করে সীতেশ।

স্ববর্ণ চলে যায়।

সীতেশ বিছানাটা নিজেই পেতে নেয়।

খোকাকে শুইয়ে তারপাশে নিজে শোয়।

শুয়ে শুয়ে বই পড়ে।

সন্ধ্যার কিছু পরে শোভনা আর মাধুরী ফেরে হেসে ঢলে পড়তে পড়তে।

ঘরের সামনে এসে মাধুরী হাসতে হাসতে বলে শায়িত সীতেশকে উদ্দেশ্য করে,—রাগ কোরনা ঠাকুরপো। হারিয়ে যায় নি। তোমার জিনিস তোমায় ফিরিয়ে দিলাম।

শোভনা এ ধরণের ঠাট্টায় বিরক্ত হয় একটু, বলে,—এ আবার কি ঠাট্টা মেজদি!

মাধুরী একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। চলে যায়।

ঘরে ঢুকেই সীতেশের বিছানায় খোকাকে দেখে আরও বিরক্ত হয় শোভনা।

এটাকে আবার পাশে শোয়ালে কেন?

কোনটা? সীতেশ বই থেকে মুখ তুলে শুধোয়।

দেখতে পাচ্ছ না? অন্ধ নাকি? এই মাত্তর ধমকালুম একটা বাইশ চব্বিশ বছুরে ছেলেকে। ঘাড়ের ওপর পড়ছিলো, বললুম,—অন্ধ নাকি! জবাব দিলে,—আপনার জন্মেই তো অন্ধ! কি ফাজিল ছেলে সব!

বলে শোভনা হাসতে থাকে।

সীতেশ কিন্তু হাসে না।

সীতেশের আকস্মিক গাম্ভীর্যে শোভনা একটুও ভয় পায় না, বরং চটে।

বলে,—ছেলেটাকে নামাও বিছানা থেকে। নোংরা ছোঁড়াটাকে দেখলে আমার গা জ্বলে।

সীতেশের অসহ্য মনে হয়।

তবু কোন উত্তর দেয়না। হয়তবা উত্তর দিতে সাহস পায় না।

—কই নামালে ?

সীতেশ উত্তর দেয় না।

শোভনা খোকার হাতটা ধরে হেঁচড়ে টেনে মাটিতে নামায়। ছেলেটা ঘুমের ভেতর চীৎকার করে ওঠে। বীরেশ ঠিক সেই সময়েই অফিস থেকে ফিরছিলো। চীৎকার শুনে ঘরের ভেতর উঁকি দেয়। শোভনাকে ফেলে দিতে দেখে খোকাকে।

সীতেশ দেখে, শোভনাও দেখে বীরেশকে।

শোভনার কিন্তু ভ্রূক্ষেপও নেই।

সীতেশের চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে।

বীরেশ একটা কথাও না বলে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়।

সীতেশ গম্ভীর ভাবে শুধোয়,—কোথায় গিয়েছিলে ?

—যেখানে খুশী।—স্পষ্ট জবাব দেয় শোভনা।

সীতেশ শোভনার সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় ঘা দেয় আজ। আস্তে আস্তে বলে,—অমন দাদার সঙ্গে বৌদির সঙ্গে তোমার কেন বনেনি বুঝতে পারছি।

শোভনার মুখটা কালো হয়ে ওঠে।

হঠাৎ কোন উত্তর মুখে আসে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সীতেশের দিকে দু'বার তাকায়। তারপর কোন কথা না বলে কাপড় চোপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ে।

এরপর প্রায় পুরো তেরোদিন সীতেশের সঙ্গে একটাও কথা বলেনি শোভনা। নিতান্ত অল্প দুটো করে খেয়ে শুয়েই কাটিয়েছে বেশী সময়। আর—সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে শেষে সীতেশকেই সাধতে হয় শোভনাকে। সংসারে মনের স্রোতে কোথায় জোয়ার আর কোথায় যে ভাঁটা ঠাওর করা নিতান্তই কঠিন। মনের এক এক অবাক আবেগের কাছে মানুষ দিনের পর দিন হেরে যায়। সাদা চোখে তার কোন কারণ খুঁজে পাওয়াও দুষ্কর হয়ে পড়ে।

সীতেশকেই অবশেষে সাধতে হয়। অনেক বার অনেক সময় ধরে সাধতে হয়

—না খেয়ে যে মরবার দশা হোল। কি আর বলেছি তোমায় যে এত রাগ।

শোভনা কথা বলে না।

শোভনার একটা হাত ধরে কাছে টেনে আনতে চায় সীতেশ।

শোভনা ফোঁস করে ওঠে,—ছুঁয়োনা আমায়, ছাড়ো।

—কেন, আমি কি মেথর?—হাসতে হয় সীতেশকে।

শোভনা নীরব।

—যা হবার হয়েছে। আর কথাও বলব না। ওঠো।

শোভনা নীরব।

—ওঠো, তুমি এমন করে থাকলে আমার যে কষ্ট হয়।

শোভনার ঝাঁজালো স্বর শোনা যায়,—কার কত কষ্ট হয় অনেক দেখেছি।

—বেশ, তবে কি করতে হবে বলো।

—দয়া করে কিছুই করতে হবে না।

শোভনার রাগ তবু যায় না।

সীতেশ এবার জোর করে শোভনাকে কাছে টেনে নেয়,—বলে—একটা কথা না হয় বলেই ফেলেছি, তাই বলে কি ক্ষমাও নেই! বিয়ের অধিকার কি একটাও থাকতে নেই।

শোভনা মুখটা নীচু করে বসে থাকে।

শোভনার মুখখানা তুলে ধরে সীতেশ। চোখদুটো ওর জলে ভরে উঠেছে।

মুখটা তুলে ধরতেই ওর গাল বেয়ে জল ঝরে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা।

সীতেশের বুকটা ভরে ওঠে আজ।

কতদিন পর শোভনার মুখখানি স্পর্শ করতে পেয়েছে ও।

বলে,—কাঁদছো কেন শোভনা?

—এ বাড়িতে আমার ভাল লাগে না। তাইত মাঝে মাঝে বেরিয়ে যাই।

—কেন বলোত?

—বলতে চাইনে।

—বলো। আমাকে না বললে আর বলবে কাকে?—স্বামীত্বের দাবী নিয়েই বলে সীতেশ।

শোভনা ভিজে ডাগর চোখদুটো মেলে তাকায় সীতেশের দিকে,—বলে,—তোমার দাদা বৌদির হাবভাব আমার ভাল লাগে না।

—কেন?

—সব সময় যেন তোমাকে আগলে রেখেছে ওরা। তোমাকে তো ভাল করে দেখতেও পাই না।

সীতেশের মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে।

—কিন্তু দাদা তো তেমন নয়!

শোভনার গলা আবার ভারী হয়ে ওঠে,—তুমি কি জানো। তোমার মনটাকে ওরা যেন বশ করে রেখেছে। তুমি যে আমার তা ভাববার অবসরই বা দেয় কই?

সীতেশ কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়ে,—কই, তেমন তো মনে হয় না।

—মনে তোমার হবে কোথা থেকে। তোমার কি মন আছে? আমি জানি আমি তোমায় ডাকলে তুমি আসবে না, কিন্তু দাদা ডাকলে তুমি মাথা নীচু করে তার সামনে যাবে তক্ষুনী।

সীতেশ কোন জবাব দিতে পারে না। কথাটা কিছুটা সত্যি এটা অস্বীকার করবার উপায় কই! সীতেশ এক দ্বন্দ্বে পড়ে যেন। এতবড় একটা সত্য কেমন সহজ হয়ে ধরা পড়েছে শোভনার চোখে।

এ কথাটা সীতেশের একবারও মনে হয় না যে দাদার কাছ থেকে তার জীবনের লাভ কতখানি, আর শোভনার কাছ থেকেই বা কতখানি। হিসেব করার মত পরিষ্কার মন আর নেই তার। বুদ্ধি যেন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

শোভনাও আর কথা বলে না।

সীতেশও নয়।

এরপর শোভনা আগের মতই সকলের সঙ্গে মিশতে থাকে। মাধুরী হেসে গড়িয়ে পড়ে। মাধুরী হাসে বেশী।

ঘরে ডেকে নিয়ে ওকে শুধোয়,—রাগ পড়ল ?

শোভনার মেজাজ খুশী, বলে—এমনি এমনি পড়েনি !

—তবে ঠাকুরপোকে পায়ে ধরে সাধতে হয়েছে নিশ্চয়ই।

—পায়ে না ধরলেও, ক্ষমা চাইতে হয়েছে। আমি তেমন মেয়ে নই মেজদি!

মাধুরী বলে ফিস্ ফিস্ করে,—কি হয়েছিল রে। দিদিকে বলতে শুনলুম, তার ছেলেকে নাকি মেরে আধমরা করে ফেলেছিস !

শোভনা হাসে,—আধমরা বললে ! মেরে ফেলেছি বললে না ! কি যে মেণ্টালিটি এদের ছোড়দি ! ভারী নীচ।

—কি করেছিলি বল না ?

—হাতটা ধরে নামিয়ে দিয়েছিলাম চৌকী থেকে।

—ওমা ! এতেই এত ! দিনকে রাত করে দিলে !

—ওরা পারে !

মাধুরী ভ্রূ কোঁচকায়,—যা বলিচিস ভাই। যেমন রূপ, তেমনি গুণ ! গাধার মত শুধু খাটতেই পারে।

শোভনা বলে,—তাছাড়া তোমার ঠাকুরপোর টাকার অভাব হয় বলেই আরও মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এখন তো সংসারেই শুনি একশ' টাকা দেয়।

—তা দিতে হবে ভাই। কত বড সংসারটা। তাছাড়া দাদার রোজগার তো কম। উনিও তো দেন প্রায় দেডশ।

—ওরে বাস্ ! বলো কি দিদি !

মাধুরী বলে,—তা না দিলে আর চলবে কেন ?

শোভনা যেন চিন্তিত হয়ে বলে,—আমার কিন্তু অন্য একটা কথা মনে হয়।

—কি ?

—যাক বলে কাজ নেই।

—কি বলনা।—মাধুরীর চোখে মুখে কৌতুহল।

শোভনা বলে,—হয়তবা ওর থেকে কিছু টাকা উনি নিজে রাখতেও পারেন।

মাধুরী যেন চমকে ওঠে,—না না, কিযে বলিস !

শোভনা কথাটা তাড়াতাড়ি চাপে,—মনে হোল তাই বললুম। কিছু মনে কোরনা।

মাধুরী বলে,—কিন্তু দাদা ভারি ভালো মানুষ।

—তোমাদের ওই এক কথা!—হাসতে থাকে শোভনা।

মাধুরী যেন একটু কি ভাবে।

কেমন যেন একটু গম্ভীর হয়। শোভনার কথাগুলো উড়িয়ে দেবার মতও নয়। অথচ এ যে হতেই পারে না। বীরেশকে মাধুরী দেবতার মত ভক্তি করে। এমন ভাসুর মানুষের হয় না। কিন্তু শোভনার কথাগুলো আজ যেন কেমন কেমন ঠেকে। শোভনা লেখাপড়া শিখেছে। তার চেয়ে বুদ্ধিমতী। কে জানে বাপু, কি ব্যাপার!

মাধুরী সহজ হয়ে বলে,—যাক, রাগত পড়েছে!

শোভনা শুধু হাসে।

—তবে চল কাল আবার বায়স্কোপে যাই।

—চলো। আমার আপত্তি কি!

দুজনেই হেসে ফেলে।

সেদিনই রাত্রে খোকাকে আদর করতে করতে সুবর্ণ তাকায় বীরেশের দিকে। বীরেশ চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে। এমন চুপ করে শুয়ে থাকতে খুব ভাল লাগে বীরেশের।

নিজেকে যেন বেশ স্পষ্ট দেখতে পায় নির্জন অবসরে।

তাছাড়া কথা কম বলা ওর যেন স্বভাব।

সুবর্ণ দুতিনবার তাকিয়ে বলে বীরেশকে,—ছেলেটাকে সেদিন এমন করে মারলে, অথচ কিছু বললেও না।

বীরেশ চমকে ওঠে। সুবর্ণর দিকে তাকায়,—কই! মারেনি তো!

—তবে কি আদর করেছে?—গায়ে জ্বালা ধরে সুবর্ণর। এমন নির্বিকার মানুষ নিয়ে তাকে ঘর করতে হয়!

—না আদরও করেনি।—বলে বীরেশ আবার কড়িকাঠের দিকেই তাকায়।

স্বর্ণ বলে,—হাজার হোক নিজের ছেলে, একটু কিছু বলতেও না পারতে ?

—কি বোলব ? চৌকী থেকে নামাতে গিয়ে পড়ে গেছে। এতে বলবার কি আছে !

স্বর্ণ বলে,—যাই বলো, শোভনা খোকাকে দুচোখে দেখতে পারে না।

বীরেশ এবার তিরস্কারের ভঙ্গীতে তাকায় স্বর্ণর দিকে,—ও সব বাজে কথা ভাল লাগে না আমার। ছোট বৌমা অতি ভাল মেয়ে। তুমি ওসব ভুল ভেবেছ।

ভুল আমি ভাবিনি। পরে বুঝবে।

বীরেশ শুধু বলে,—তোমার রান্না শেষ হয়েছে। যাও ভাত বাড়োগে যাও।

স্বর্ণর গলা ভারি হয়ে আসে, বলে—আমাকে তো ঝি করেই রাখলে চিরটাকাল। সবাই ভাল। আমিই শুধু মন্দ। বুঝবে।

বীরেশ কথা বলে না।

—তোমার কি চোখও নেই।

বীরেশ বিরক্ত হয়ে বলে,—আঃ ! ভাল লাগছে না যাও।

—যাব আর কোথায় ! যমের বাড়ির পথ জানা থাকলে চলে যেতুম।

বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় স্বর্ণ।

বীরেশ চুপ করে তেমনিই শুয়ে থাকে। যাবার সময় স্বর্ণ আলোটা নিভিয়ে দিয়ে গেলো। অন্ধকারে বেশ ভাল লাগে বীরেশের। অনেক কথা ভাবা যায়। সংসার থেকে অনেকটা ওপরে উঠে সংসারের বিচিত্র রংগরস প্রাণ ভরে দেখা যায়। মনে মনে হাসা যায়। কি সুন্দর অথচ কি নিষ্ঠুর এ সংসার। প্রতিটি মানুষ তার মনের কতকগুলো দুর্নিবার অসংগত কিংবা সংগত ইচ্ছের বাঁধনে দিন রাত ঘুর পাক খেয়ে চলেছে। কবে যে এর শেষ কেউই বা জানে। বীরেশ ওর মনের দানা বাঁধা ইচ্ছেগুলোকে ভালো করে দেখতে পায়। সবগুলো ইচ্ছেই কিন্তু এক বিরাট মনের কল্পনা যেন।

সুমধুর সুনিপুণ কল্পনা। বীরেশ অবাক হয়। মনে মনেই অবাক হয়। এ কথা তো কাউকে বলবার নয়। বললে কেই বা বোঝে !

সীতেশের পরিবর্তনটা এত স্পষ্ট যে বীরেশ ওর আসল চেহারাটা পুরো-পুরিই দেখতে পায় যেন। এক রূপময়ী নারীর মোহে সীতেশের সকরুণ আর্তনাদ। কষ্ট লাগে বীরেশের। একটু লাগে বই কি। শোভনার নিপুণতায় বিস্ময় লাগে, তবু একটা আতংকও যে না আসে এমন নয়। স্বাধিকারপ্রমত্তা শোভনার এ মত্ততা সত্য নয়। কখনই নয়। সত্যকে শোভনা পাবে। পাবেই একদিন। বীরেশ মেয়েটিকে ব্যর্থ দেখতে চায় না। বেদনা পায় ও শোভনার প্রমত্ততায়।

বীরেশকে স্থিতধী হতে হবে। ধীর পায়ে চলতে হবে সংসারের সূক্ষ্ম চুল পরিমাণ পথে। একটু বিভ্রান্ত হলে অবশ্যই তাকে তলিয়ে যেতে হবে। একেবারে।

বীরেশ নিজের কপালটা টিপে ধরে। ওঠে ধীরে ধীরে। আলো জ্বালে। একখানা বই নিয়ে বসে। বইটি গীতা। জীবনের এক এক সোপানের এক এক নির্দেশ জানায় এই ছোট্ট বইখানা।

বীরেশ নিঃশেষ হয়ে যায় গীতার ভাব সমুদ্রে।

আরও বছর খানেক কাটে, প্রতিটি দিন অসংখ্য ঘটনা চিন্তায় ভরা। তবু সব মিলিয়ে যেন একটা বাঁধা সুরেই চলতে থাকে সংসারটা।

দিন দিন অসহ্য লাগে শোভনার। এ ভাবে থাকতে সে আর পারবে না। এক ধীর স্থির মানুষ এই বীরেশ। এঁর শান্ত চোখের কঠিনতার নীচে হাঁপিয়ে উঠতে হয় শোভনাকে। এ লোকটাকে সে যেন সহ্য করতেই পারে না।

এর চেয়ে সীতেশের ভীত শংকিত দৃষ্টি, সব কিছু মাথা নীচু করে মেনে নেয়ার ভংগিটা শোভনার ভাল লাগে। সীতেশ ছেলেটি সত্যই বড় ভাল। ওকে নিয়ে বেশ মানিয়ে চলতে পারে। শোভনার প্রাণ-প্রাচুর্যে যা-খুশী আবেগে একটু বাধা ত দেয় না সীতেশ। বড় ভাল।

কিন্তু ভয় লাগে এই বীরেশকে। কিছু বলে না। তবু ভয় লাগে। মিষ্টি স্বরে দুটো কথা বলে, কিন্তু কথা দুটোর ভার যেন হিমালয়ের মতো

ভারী। ওর বুকে চেপে বসে। ইচ্ছে করেই অগ্রাহ্য করবার চেষ্টা করে শোভনা।

হয়ত বা বীরেশ বলে,—ছোট বৌমা আছো?

রান্নাঘরের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল শোভনা। তাকায় একবার।

বীরেশ বলে,—তেলের বাটিটা দাও তো মা।

শোভনার মনটা অকারণে উত্তেজিত হয়। তেলের বাটিটা তো দিদির কাছে চাইলেই পারেন।

দিদি রান্নাঘরেই বসে আছেন।

শোভনা সুবর্ণকে বলে,—দাদাকে তেলের বাটিটা দেবেন।

বলে হন্ হন্ করে চলে যায় নিজের ঘরের দিকে।

বীরেশ প্রথমটা একটু অবাক হয়।

তারপর একটু হেসে সুবর্ণর হাত থেকে তেলের বাটিটা নেয়।

সুবর্ণ অত বোঝে না। বোঝবার সময়ই বা কই। নিদারুণ পরিশ্রমে ওর চিন্তা করবার শক্তিও লোপ পেয়েছে।

বীরেশ এ মাসে সীতেশের কাছে পঁচিশটা টাকা বেশী চেয়েছে।

শোভনা আড়াল থেকে কথাটা শুনতে পায়।

সীতেশকে বলে,—না, বেশী টাকা দেয়া চলবে না। এ মাসে পঁচাত্তর টাকা দেবে। আবার একখানা সাড়ী কিনতে হবে বিয়াল্লিশ টাকা।

—বিয়াল্লিশ টাকা—সীতেশের কণ্ঠে হয়ত বা একটু বিস্ময় প্রকাশ পায়।

শোভনা ভ্রূ কোঁচকায়,—কি চমকে উঠলে যে! আজ পর্যন্ত একখানা ভাল সাড়ীও তো কিনতে পারিনি। একটু লজ্জাও হোল না।

লজ্জা হবার মতো অবস্থা তখন সীতেশের নেই।

—তা ছাড়া—।

—তা ছাড়া কি?

শোভনা স্পষ্ট বলে,—আমার মনে হয় সংসারে এত টাকা লাগে না। লাগবার কথা নয়। কি খাওয়া হয় শুনি!

সীতেশ অবাক হয়,—বলে,—কি করে জানলে এত লাগে না।

শোভনা সীতেশের পাশে এসে বসে,—দেখ, সংসার কখনও করিনি বলে কি কিছুই জানি না। মেয়ে মানুষ আমি। আমার চোখকে ফাঁকি দেয়া অত সহজ নয়। তাছাড়া এদিককার আমার সাড়ী জামা ছাড়া মাসে কিছু খরচও তো আছে। কার কাছে আর চাইব বলো?

অর্থাৎ শোভনা বলতে চায় মোলায়েম করে যে দাদার সঙ্গে তো সম্পর্ক উঠেই গেছে, সীতেশ ছাড়া ওকে আর দেবার কে আছে?

সত্যিই তো! সীতেশ কিছুটা বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে ওর কথায়।

—হোস্‌টলে থাকতে এমন খাওয়া কখনও মুখে তুলতে পারতুম না। দাদার ওখানে তো নয়ই।

এও সত্য। সীতেশ মাথায় হাত দিয়ে ধীরে ধীরে বলে,—দাদা তা হলে সব টাকা খরচ করে না?

—কক্ষনো নয়। উনি নিশ্চয়ই টাকা সরাচ্ছেন।

বজ্রের মত বিঁধে পড়ে কথাটা সীতেশের বুকে,—কি বোলছ তুমি? এ কখনও হতে পারে না। দাদাকে তুমি চেনো না।

—তোমরাই চেনো না। ভক্তিতে অন্ধ হয়ে আছো—শোভনা বলে।

সীতেশ কথার জবাব দিতে পারে না। এ অসম্ভব। দাদাকে সে চেনে। শৈশব থেকে চেনে। দাদার জ্বলন্ত ত্যাগের প্রমাণ সে বহুবার পেয়েছে। শোভনা ভুল করেছে।

তবে কি দাদার চরিত্রে কতকগুলো দিক সত্যিই তার জানা নেই। সেই কি এতকাল ভুল করে এসেছে? অসম্ভব। তার এত বড় ভুল হতে পারে না। কিন্তু কত খরচ হয় সংসারে এ কথা তো কখনও তারা শুধোয় নি। এক আধ মাসে তো টাকা বাঁচতেও পারে। কই দাদা তো বলে না কিছু। বেশী খরচ হতেও তো পারে, তাও তো দাদা কিছু বলে না। কেন বলে না।

তবে দেখা যাক না এ মাসে পঁচাত্তর টাকা দিয়ে দাদা কি বলে। তখন বোঝা যাবে সব।

সে মাসে সীতেশ মাইনে পেয়ে বীরেশের কাছে গিয়ে টাকা সামনে রেখে বলে,—পঁচাত্তর টাকা দিলাম। এ মাসে আর পারলাম না।

বীরেশ একটু হেসে বলে,—বেশ তো। যা পেরেছিস দিয়েছিস। ওতেই হবে। সীতেশ আর কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ওর তৎক্ষণাৎ মনে হয় তবে তো শোভনা ঠিকই বলেছে।

খরচ বেশী হলে দাদা নিশ্চয়ই আপত্তি কোরত।

কিন্তু কই কিছুই তো বললে না। বললে পঁচাত্তর টাকায় হয়ে যাবে।

তবে কি এতদিন দাদা টাকা জমিয়েছে।

শোভনাকে গিয়ে না বলে পারে না,—তোমার কথাই ঠিক। এতদিন বোকা হয়েই ছিলাম।

—তবে! তোমরা বিশ্বাসই করো না আমার কথা।—শোভনা ওর হাত থলেটিতে ছোট্ট আয়নাটা ভরতে ভরতে বলে।

সীতেশ ওকে কাছে টেনে নেয়।

শোভনা আজকাল আর আপত্তি করে না।

সীতেশ ঘামতে থাকে এক আবিষ্কারের উত্তেজনায়,—ছিঃ ছিঃ, দাদা যে এমন, এত ভাবতেই পারিনি।

শোভনা হাসে—অনেক কিছুই তোমরা ভাবতে পারো না।

সীতেশ শোভনার দিকে তাকিয়ে বলে—যা ভাবতে পারি না, তুমি এবার থেকে বলে দিও।

শোভনা হাসে। খুব হাসে।

বীরেশ পঁচাত্তরটা টাকা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে থাকে। কি করে ও এ মাসের খরচ চালাবে ভেবে কূল কিনারা পায় না।

সুবর্ণ ঘরে ঢোকে ছোট মেয়ে কোলে নিয়ে।

বীরেশকে টাকা নিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে দেখে বলে—কি হোল তোমার?

বীরেশ তাকায় সুবর্ণর দিকে।

চিন্তায় ওর মাথাটা কেমন করতে থাকে। বলে—এক গেলাস জল দাও তো। বলচি।

সুবর্ণ এক গেলাস জল দেয়।

বীরেশ জলটা ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে নেয়। একটু হেসে বলে—সীতেশ এবার টাকা কিছু কম দিয়েছে।

সুবর্ণ বলে,—বললেই পারতে এতে চলবে না।

বীরেশ ধীরে ধীরে বলে,—কি করে বলি। বলা কি যায়?

—কেন যায় না?

—বিয়ে করেছে। এখন ওর ওপর চাপ দেয়াটা ঠিক হয় না। এক কাজ করো।

—কি?

—খোকার দুধটা এ মাসে বন্ধ করে দাও।

সুবর্ণ অবাক,—কি বোলচ! একে তো এই চেহারা। মরে যাবে যে!

বীরেশ শান্ত হেসে বলে,—মরবে না সুবর্ণ। তুমি এ মাসটা ওর দুধ বন্ধ করে দাও—আর আমার—

—তোমার কি?—আতংকে চমকে ওঠে সুবর্ণ।

বীরেশ আস্তে আস্তে বলে—আমার বিকেলের জলখাবারের মুড়িটাও বন্ধ থাক।

সুবর্ণ স্থির হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে বীরেশের দিকে। ওর চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ে।

বীরেশ সুবর্ণর কাছে এসে বলে আরও আস্তে,—একটা মাসই তো—।

সুবর্ণ বীরেশের হাতখানার ওপর মাথাটা রেখে কাঁদে। অনেক কাঁদে আজ।

বীরেশ ওকে কাঁদতে দেয়।

একটা কথাও বলে না।

সুবর্ণ বলে, অনেক পরে বলে—চাল বরং এ মাসে কম এনো। কিন্তু তোমার মুড়ি একমুঠো খেতেই হবে।

চাল কম আনলে কি করে হবে?

সুবর্ণ চুপ করে থাকে।

বীরেশ মৃদু হেসে বলে,—বুঝেছি। নিজে ভাত কম খাবে! তা কি হয়। যা বললাম তাই করো।

সুবর্ণ চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

শুধু একমাস! একমাস কোনমতে কেটে যায়। তাতেই কি শেষ? এঁকে বেঁকে চলাই যে মনের ধর্ম। সীতেশের মনে যে ভাবাবেগ উল্টোপথে যেতে সুরু করেছে, তাকে বাঁধ দেয়া সীতেশের পক্ষে দুঃসাধ্য। সীতেশ আজকাল দাদার সব আচরণগুলোরই অন্য মানে করতে সুরু করে।

ব্যাপারগুলো খুবই সামান্য।

হয়তো বীরেশ বোলল সেদিন সুবর্ণকে—আমার শরীরটে ভাল নেই, আজ রাত্রে বরং পাউরুটি আনিও আমার জন্যে।

সীতেশ কথাটা শুনতে পায়।

ঘরে এসে বলে শোভনাকে—শুনলে?

—কি?—শোভনা বিছানা করতে করতে শুধোয়। আগে আগে বিছানাটা সুবর্ণ করে দিত। এখন আর করে না। বরং বলা যায় শোভনাই করতে দেয় না। সুবর্ণর নোংরা কাপড় আর কুশ্রী রূপের জন্যেই হয়ত বা শোভনার অন্তর থেকে একটা ঘৃণার ভাব আসে। নাকটা কুঁচকে বলে—থাক দিদি, বিছানা আমিই করে নেব।

দু' চারদিন বলতেই সুবর্ণ ওর মনোভাব কিছুটা বোঝে। আর বিছানা করতে আসে না।

বিছানাটা ভাল করে ঝাড়তে ঝাড়তে বলে শোভনা,—কি হোল?

—দাদার পাউরুটির অর্ডার হোল।

—কেন?

—তাঁর নাকি শরীর ভাল নেই। আমাদের তো অমন কতদিন শরীর খারাপ হয়, কই আমাদের জন্যে তো পাউরুটি আসে না।

শোভনা মুখ টিপে হেসে বলে,—তোমাদের জন্যে কেন আসবে? তোমরা কি বাড়ির কর্তা?

—দেখনা কি করি।—গুম হয়ে থাকে সীতেশ।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা বীরেশের সামনে বলে সীতেশ। সুবর্ণকে লক্ষ্য করেই বলে,—আজ শরীরটা আমার খারাপ বৌদি। লুচি কোর ক'খানা আমার জন্যে

বীরেশ ব্যস্ত হয়ে বলে,—কি হোলরে? কি অসুখ?

সীতেশ গম্ভীর মুখেই বলে,—শরীরটা ভাল নেই।

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সুবর্ণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ পর বলে বীরেশকে,—একটু ঘি আনিয়ে দাও। লুচি হবে কি দিয়ে?

—ঘি!—কি যেন গভীরভাবে ভাবতে ভাবতে বলে বীরেশ,—হ্যাঁ, একটু ঘি আনাও।

বারো আনা খুচরো আছে পকেটে। নিয়ে যাও।

—কে আনবে? তুমিই এনে দাও।

—আমি? আচ্ছা, তাই যাচ্ছি। একটা বাটি দাও।

বীরেশকেই যেতে হয় দোকানে।

এমনি ছোটখাট কতই না ঘটনা। দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে যেন সংসারের মনের ছবিগুলো।

পরের মাসেও সীতেশ পচাঁত্তর টাকাই দেয়। কিছু বলে না।

বীরেশ টাকাটা নিয়ে বলে,—কত দিলি?

—পঁচাত্তর। এর বেশী আর পারব না।

বলার ভংগি কিছুটা রূঢ় যেন। সীতেশের নিজের কাণেই লাগে।

বীরেশ আর কথা বলে না। মুখটা ওর কালো হয়ে ওঠে।

ধীরেশ টাকা দিতে আসবার আগে মাধুরী ওর জামাটা ধরে টানে।

—শোন!

—কি?

মাধুরী ফিস্‌ফিসিয়ে বলে,—ঠাকুরপো কিন্তু মোটে পঁচাত্তর টাকা দিচ্ছে দু' মাস ধরে।

—তাই নাকি ? কেন ?

—শোভনার খরচায় কুলোয় না তাই।

—বারে ! তা কি করে চলবে ! সংসার চলবে কি করে।—চটে ওঠে ধীরেশ।

মাধুরী হাসে,—তোমার যেমন বুদ্ধি ! শোভনা টাকা দিতে দেয় না কেন জানো ?

—কেন ?

—ও বলে দাদা নাকি সংসার খরচ থেকে জমায়।

ধীরেশ আগুন হয়ে ওঠে,—কক্ষনো নয়। এ সব বাজে কথা। বলতে লজ্জাও হয় না তোমাদের !

মাধুরী বলে,—তা আমি কি বললুম !

—তুমি কি বললুম মানে ? বৌমা কথাটা খুবই অন্যায় বলেছে।

—আচ্ছা হতেও তো পারে !

ধীরেশ কিছুক্ষণ ভাবে, বলে,—তবে একটা কথা ভাবছি। সীতেশ কম দিলে আমি বেশী দিয়ে মরতে যাব কেন ?

—আমিও তো বলছি।—বলে মাধুরী হাসে। বলে,—মাসে পঞ্চাশ টাকা কম দিলে আমার একজোড়া কংকন তো হতে পারে। অনেকদিন থেকে সখ আছে।

—তা বটে ! তবে এ মাসেই কম দোব।

ধীরেশ একটু সোজা বোঝে। সোজা কথা বলে।

ও সটান গিয়ে বীরেশকে বলে,—এ মাস থেকে পঞ্চাশ টাকা কম নিতে হবে দাদা। দোকানের অবস্থা তেমন ভাল নয়।

বীরেশ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় ধীরেশের দিকে।

—কি কোরব ! দিন কাল যা পড়েছে।—ভ্রূদুটো কুঁচকে বলে ধীরেশ।

ধীরেশের চোখ দুটোয় ক্রমশ যেন নিতান্ত অসহায় দৃষ্টি ঘনিয়ে আসে।

ধীরেশ টাকাটা ফেলে দিয়ে চলে যায়।

বীরেশ টাকা কুড়িয়ে নিয়ে চুপ করে বসে থাকে। হাত পাগুলো ঠাণ্ডা হয়ে আসে। মাথার ভেতরটা কেমন গুলিয়ে যেতে থাকে।

অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে ধীরেশের ঘরে যায়।

দাদাকে দেখে মাধুরী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আড়ালে দাঁড়ায়।

বীরেশ দুবার কেসে নিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে বলে,—এত কমে কি করে চলবে বলতো ?

ধীরেশ হঠাৎ চটে ওঠে,—কেন চলবে না শুনি ? আমরা দুটি লোক। সীতেশরাও দুটি লোক। না চলবার কি আছে।

বীরেশ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

পা দুটো ওর কাঁপতে থাকে।

আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মনে মনে খুবই হাসি পায় ওর। ওরা আজ স্বার্থ দেখতে শিখেছে। শিখবেই তো ! দোষত তারই। ভাই দুটিকে এখনও সেই ছোট্ট দুটি ভাই মনে করেই ভুল করেছে। ওরা তো বড় হয়েছে। ওরা জোরালো গলায় তার ওপর রাগ করতে শিখেছে। তার কথার কঠিন প্রতিবাদ করতে শিখেছে।

বীরেশ ঘরে এসে শুয়ে পড়ে।

হঠাৎ কেমন যেন চারিদিকটা আজ বড়ই ফাঁকা লাগে।

কোলের কাছে গীতাটি টেনে নেয় বীরেশ।

এক মনে পড়তে থাকে।

পড়তে পড়তে মনটা আবার ওর ভরে আসে। ভরে আসে এক প্রশান্ত সান্ত্বনায়।

আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শুধু চুপ করে শুয়ে থাকে ও।

সুবর্ণ ঘরে ঢোকে মেয়েকে দুধ খাওয়াতে।

আলোটা জ্বালে।

বীরেশ উঠে বসে।

বীরেশ চুপ করে দেখে সুবর্ণ মেয়েকে খাওয়াচ্ছে।

হাত দুখানি সুবর্ণর কত রোগা! কাঁধের হাড়দুটো বেরিয়ে গেছে। চোখদুটো বসে গেছে ভেতরে। সাড়ীটা আঁচলে কিছুটা ছেঁড়া। আর কি ময়লা।

ধীরে ধীরে বলে,—কাপড়টা ধোপা বাড়ি দিতে পারো না?

সুবর্ণ মেয়ে কোলে নিয়ে তাকায়। হেসে বলে,—কেন বলোত?

হাসিটা সুবর্ণর যায় না।

বীরেশ বলে,—বড্ড ময়লা হয়েছে তো?

—তাহোক, তোমার দেখবার দরকার নেই।—তবু সুবর্ণ বলে না যে সাড়ী মোটে দু'খানা।

বীরেশ বোধহয় আন্দাজ করে, বলে,—সাবান দিলেও তো পারো!

সুবর্ণ খুব হাসে। অনেক হাসবার পর বলে,—সাবান এনে দিও।

বীরেশের মুখটা শুকিয়ে ওঠে। বলে না আর কিছু।

মেয়ে খাওয়ানো হয়ে যায়।

সুবর্ণকে ডাকে বীরেশ,—শোন।

—কি?

—কাছে এসো।

সুবর্ণ বলে,—কাজ আছে এখন।

—একটু শোন। কাছে এসে বোস। বীরেশ মৃদু হেসে বলে,—একটা কথা বলব। রাগ করতে পারবে না।

—তোমার ওপর? রাগ? করতে দেখেছ কোনদিন?

—দেখিনি। তবু বললুম।

—বলো। কি কথা।

—মানে, এ মাসে অনেক খরচ কমাতে হবে।

সুবর্ণর মুখটা শুকিয়ে ওঠে। বলে,—কেন, ওরা বুঝি টাকা দেয়নি।

বীরেশ একটু ইতস্তত করে বলে,—না, মানে, কিছু কম দিয়েছে।

—এ মাসেও ?

—হ্যাঁ। তাহোক। চালাতে আমাকে হবেই। কি করা যায় বলোত ?

—আমি জানি না।—মুখটা নীচু করে সুবর্ণ।

—কিছু খরচ যদি কমানো যায়।

—কি কমাবে শুনি। কোন খরচটা বেশী হচ্ছে ?

—তা নয়। তবে ভাবছি—। বলে বীরেশ চুপ করে থাকে।

—কি ভাবছ ?

—কই কিছুই তো ভেবে ঠিক করতে পারছি না।

সুবর্ণ বলে,—তবে আমি যা বলি, করবে ?

—বলো।

—বাজার তিনটাকা না করে একটাকা করো।

বীরেশ বলে,—কিন্তু ওদের যে খাবার কষ্ট হবে।

—টাকা কম দিলে খাবার কষ্ট করতেই হবে। তবে তো বুঝতে পারবে।

বীরেশ কথা বলে না।

সুবর্ণ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে চলে যায়।

সংসারে সকলেরই মনগুলো সব ভারী-ভারী। যেন কোন এক অদম্য আবেগকে চেপে রেখেছে সবাই। শুধু বলবার অপেক্ষা মাত্র।

বলতে আর কেউ পারে না।

বাজার কম করতেই হয়।

খেতে বসে সীতেশের মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। ধীরেশ রেগে ভাত ফেলে উঠেই যায় কয়েকদিন। সব কথা শুনতে হয় সুবর্ণকে। বীরেশকে বলবার সাহস এখনও এতটা হয়ে ওঠেনি। সুবর্ণ ধীরেশের রাগ, সীতেশের চাপা বিদ্বেষ নীরবে সয়ে যায়। বীরেশের বিশুষ্ক মুখখানার কথা ভেবে ওকে সব সইতে হয়।

সবাই-ই বোঝে যে এভাবে আর চলছে না। এভাবে আর চলবেও না।

সেদিন সন্ধ্যায় সীতেশ বাড়ি ছিল না। শোভনার এক বান্ধবীর স্বামী এসেছিলো বেড়াতে। বান্ধবী আসতে পারেনি। সে গেছে বাপের বাড়ি। শরীর খারাপ তাই। হোস্টেলে থাকতেই বিয়ে হয়েছিলো ওদের। প্রগাঢ় পরিচয়ের পরে বিয়ে।

শোভনা ওর স্বামীর সঙ্গে তামাসা গল্প কোরত। ওদের সঙ্গে সিনেমা যেত, বেড়াতে যেত। ভদ্রলোক খুব ভালোমানুষ আর ধনী পুত্র।

ভদ্রলোক বাসার খোঁজ নিয়ে এসে দরজার কড়া নাড়ে।

শোভনাই গিয়ে দোর খুলে দেয়,—ওমা অতীনবাবু যে!

অতীনবাবু চশমাটা মোছে, বড় মধুর হাসে,—বিয়েতে কি একটা খবরও দিতে নেই।

—খবর দেবার মতো সময় কি আর ছিল। আসুন। ভেতরে আসুন।

অতীনবাবু ভেতরে ঢোকে। শোভনা ওর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায়।

শোভনা মুখ টিপে হেসে বলে,—ঠিকানা কোথেকে পেলেন?

—তোমার দাদার কাছ থেকে।

—দাদা বৌদির সঙ্গে দেখা হোল?

—হ্যাঁ।

—কেমন আছেন ওঁরা?

—ভালই।

তারপর বান্ধবীর কথা শুধোতে হয় শোভনাকে যথারীতি।

যথারীতি জবাব। অতীনবাবু সীতেশের খোঁজ করে। শোনে বাড়ি নেই।

ইতিমধ্যে সুবর্ণর ছেলেটি ঘরে ঢোকে। ময়লা একটা ইজের পরা। খালি গা। মুখে কতগুলো বিশ্রী দাগ। শোভনা ধমকায়,—যা, এ ঘর থেকে যা। যা বলচি।

খোকার কানদুটো ধরে বার করে দেয় শোভনা। খোকার কান্নার শব্দ শুনে বীরেশ বাইরের দিকে আসে।

অতীনবাবু শুধোয়—কে ছেলেটি?

শোভনার মুখটা শুকিয়ে যায়। বলে,—কে? এই ছেলেটা আমাদের ঝিয়ের ছেলে।

বীরেশের কাণে যায় কথাগুলো।

সঙ্গে সঙ্গে চোখমুখ ওঁর লাল হয়ে ওঠে। কয়েক টুকরো আতপ্ত অংগারের মতো কথাগুলো যেন ওঁর স্নায়ুকেন্দ্রে গিয়ে জ্বালা ধরায়।

শোভনা দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

অনেকক্ষণ আলাপের পর অতীনবাবুকে ঘর থেকে মিষ্টি বার করে জল খাইয়ে বিদেয় করে শোভনা।

বীরেশ ঘরে বসে ভাবে কথাটা বলবে কিনা।

একটা প্রতিবাদ করবে কিনা!

না। এটা ঠিক হবে না। নিজের সন্তানের হয়ে সীতেশের স্ত্রীকে সে কিছু বলতে পারে না।

তবু সীতেশের স্ত্রীর ঔদ্ধত্যের একটা জবাব আজ দেয়া দরকার।

বীরেশ ওঠে।

শোভনার ঘরে ঢোকে। শোভনা অতীনবাবুকে বিদেয় করে খাটে শুয়ে বই পড়ছিল। সীতেশের অপেক্ষায় ছিল।

বীরেশ ডাকে,—বৌমা!

শোভনা উঠে বসে। মুখটা ওরও শুকিয়ে যায়। দাদা তো কখনও এভাবে ঘরে আসে না। আজ হঠাৎ কেন এলো?

বীরেশ ধীর কণ্ঠে বলে,—একটা কথা ছিল তোমার সঙ্গে।

শোভনা মুখ নীচু করে দাঁড়ায়।

বীরেশ একটু দৃঢ় স্বরে বলে,—তুমি এটা খুবই অন্যায় করেছ বৌমা। বাড়িতে কোন অপরিচিত মানুষ এলে আমি বাড়ি থাকতে আমায় খবর দেয়া তোমার উচিত।

শোভনার মুখও রাঙা হয়ে ওঠে,—অত উচিত অনুচিত তো ছোটবেলা থেকে শিখিনি।

বীরেশ বলে,—তবে এখানে আমার কাছ থেকে শিখে নিও।

শোভনা বলে,—এসেছিলো আমার এক বান্ধবীর স্বামী। তাকে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার কি প্রয়োজন বুঝলাম না।

বীরেশ নিতান্ত বিরক্ত হয়,—বলে,—আছে প্রয়োজন। তাছাড়া তার জল খাবারের বন্দোবস্ত আমারই করা উচিত।

সীতেশ ইস্কুল থেকে ফিরেছে। ঘরে ঢোকে সীতেশ।

বীরেশ বলে,—তাছাড়া কাউকে না ডেকে তোমার তার সঙ্গে ওরকম একা একা গল্প করাটাও আমি পছন্দ করি না।

সীতেশ শুধোয়,—কি হয়েছে?

শোভনার স্বর ভেঙে পড়ে,—হবে আর কি! অতীনবাবু এসেছিলেন আজ। তুমি তো শুনেছ অতীনবাবুর কথা। তার সঙ্গে গল্প করেছি, তাই দাদা পছন্দ করেন না।

সীতেশ একেই সারাদিন খেটে এসেছে, তার ওপর বীরেশের এই ধরণের কথায় আগুন হয়ে ওঠে। হঠাৎ চীৎকার করে বলে,—বেশ করেছ গল্প করেছ। তা কি হবে? কি এমন অপরাধ হয়ে গেছে।

বীরেশ দৃঢ় স্বরে বলে,—তুই চেঁচাচ্ছিস কেন?

সীতেশ আরও চেঁচায়,—একশ' বার চেঁচাব। একশ' বার গল্প কোরবে। তোমার না পোষায় তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও।

সুবর্ণ, মাধুরী সবাই ছুটে আসে।

সুবর্ণ এসে সীতেশকে ধরে,—থামো ঠাকুরপো!

—না, থামব না। অত ভয় কিসের? এ্যাদ্দিন আমাদের টাকা থেকে টাকা জমিয়েছেন। এখন আবার টাকা কম দিয়েছি বলে ছাইপাঁশ খাওয়াচ্ছেন। আবার লম্বা লম্বা কথা।

—আমি টাকা জমিয়েছি!—বীরেশের মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে যায়।

—আলবৎ জমিয়েছ। ভেবেছ আমরা কিছু বুঝি না।

বীরেশের কাছে পৃথিবীটা যেন একেবারে শূন্য মনে হয় অকস্মাৎ। সীতেশ এর চেয়ে কয়েক ঘা চাবুক মারলেও সে সহ্য করতে পারত।

বীরেশ যেন শূন্য থেকে কথা বলে,—তুই আমায় চোর বললি?

সীতেশ বলে,—একশ' বার চোর।

বীরেশ হঠাৎ এগিয়ে এসে সীতেশের দুগালে কয়েকটা চড় বসিয়ে দেয়, চোখ দিয়ে বীরেশের টস্ টস্ করে জল গড়ায়। বলে,—এই শেষ শাসন করে গেলাম। আর আসব না কখনও। বলে দু'হাতে চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বীরেশের চোখে কেউ কখনও জল দেখেনি।

সুবর্ণও নয়। সীতেশও নয়। কেউ নয়।

ওরা সবাই স্তম্ভিত হয়ে যায়। নড়বার ক্ষমতাও থাকে না ওদের।

সবাই এক মুহূর্তে মূক হয়ে যায়।

রাত প্রায় ন'টায় ধীরেশ বাড়ি ফেরে। সব কথা শোনে মাধুরীর মুখে। শুনে সীতেশের ঘরে আসে।

—হ্যাঁরে তোকে দাদা মেরেছে?

সীতেশ বোবার মতো বসে আছে।

—সত্যি কথা বলিচিস বলে মার। চল তো দেখি কেমন মারে।

সীতেশ কথা বলে না।

ধীরেশ গজ্ গজ্ করে,—ওঃ! টাকাগুলো গ্যাঁটে পুরবেন। আবার বলতে গেলে মার! দেখে নেবো কাল সকালে।

ধীরেশ চলে যায়।

শোভনা ঘরে ঢোকে। বলে,—চলো খাবে চলো। অমন করে বসে রইলে কেন?

সীতেশের চুলে আদর করে হাত বুলিয়ে দেয় শোভনা।

সীতেশ ভয়ে ভয়ে তাকায় শোভনার দিকে।

তারপর ওঠে।

উঠে ধীরে ধীরে বীরেশের ঘরের দিকে এগোয়।

এতরাত পর্যন্ত কেউ বীরেশের ঘরের দিকে যেতে সাহস করেনি।

সবাই আতংকে চমকে ওঠে।

সীতেশ মারবে নাকি দাদাকে।

সীতেশ ঘরে ঢোকে।

দরজার আড়ালে স্বর্ণ, মাধুরী শোভনা সবাই আতংকিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ধীরেশ আসে না। সে হোটেলের কাজ চুকোতে আবার বেরিয়ে যায়।

সীতেশ ঘরের মেজেতে দাঁড়ায়।

বীরেশ বিছানার ওপর উপুড় হয়ে আছে।

কাঁদছে। তখন থেকে কাঁদছে।

এগোয় সীতেশ। বালিসটা ভিজে গেছে চোখের জলে।

সীতেশ পায়ের কাছে গিয়ে পাটা ধরে,—দাদা!

—কে?

—দাদা আমায় ক্ষমা করো।—উপুড় হয়ে পায়ের ওপর মাথা রাখে সীতেশ। কাঁদতে থাকে।

বীরেশ ওঠে।

সীতেশকে দুহাতে ধরে ওঠায়।

সীতেশ কাঁদে,—আমাকে ক্ষমা করো দাদা!

বীরেশ ওকে জড়িয়ে ধরে,—ক্ষমা তো আমি করেছি রে। তোর ওপর রাগ করতেও যে আমি পারি না।

সীতেশ পাটা ধরে বলে,—তুমি চলে যেও না দাদা!

বীরেশ ওর পিঠটায় হাত দেয়,—যেতে আমাকে হবেই। তোদের ভালর জন্যেই যাব। কাঁদিসনে। ওঠ।

ওকে আবার উঠিয়ে বসায়।

বাইরে স্বর্ণ চোখ মোছে। মাধুরীও।

শোভনা সরে গিয়ে নিজের ঘরে চলে যায়।

বীরেশ কথা বলতে পারে না আর।

সীতেশও নয়।

অনেক পরে বীরেশ বলে,—চল খাবি চল। রাত হোল।

সীতেশ চোখ মুছে ওঠে।

ধীরেশও ওঠে।

সুবর্ণ আর মাধুরী তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে চলে আসে ভাত দিতে।

ধীরেশ কিছুতেই থাকল না। পরদিনই সকালে কাছাকাছি একখানা খোলার ঘর ভাড়া কোরল বারো টাকায়। বিকেলেই চলে যাবে।

সীতেশ সমস্ত দিন ঘরে বসে রইলো।

শোভনা বলেছিলো একবার,—বেরোবে না আজ।

ভয়ে ভয়ে বলে সীতেশ,—শরীরটা ভাল নেই।

শোভনা ভ্রূ দুটো কুঁচকে বলেছিলো,—শরীর, না মন?

সীতেশ একবার তাকিয়েছিলো শোভনার দিকে। কথা বলেনি।

ধীরেশ রাত্রেই শুনেছিলো সব।

সকালে উঠে মাধুরীকে শুধোল,—কই চা দিলে না?

মাধুরী চুপ করে বসেছিলো,—বললে,—উনুনে তো আগুন পড়েনি।

—কেন? আজ কি খাওয়া বন্ধ নাকি?

মাধুরী একবার তাকায় ধীরেশের দিকে। কথা বলে না।

ধীরেশ চটে ওঠে একটু,—কি হোল? ড্যাব ড্যাব করে তাকাচ্ছ কেন?

মাধুরী বলে,—ঘুম থেকে তো উঠলে আটটায়। দাদা চলে যাচ্ছে শুনেছ?

—ও আর শুনব কি! ও তো জানা কথা! না গেলে তাড়াতে হোত!

মাধুরী স্তম্ভিত হয়ে বলে যেন,—একটু লজ্জাও হয় না তোমার?

ধীরেশ বলে,—লজ্জা আমার নয়। দাদারই হওয়া উচিত। যাও চা নিয়ে এসো।

—পারব না।—মাধুরী বসে থাকে তেমনি।

—উনুনটা আগুন দিয়ে দাও। আমি করে নোব।

মাধুরী ফোঁস করে ওঠে,—আমি পারব না। এ্যাদ্দিন দিদি রেঁধেছে। এখন ঠাকুর রাখ। রাঁধতে আমি পারব না।

ধীরেশ আর কথা বলে না। জামাটা পরে।

বেরিয়ে যাবার মুখে সুবর্ণ ঘরে ঢোকে চায়ের কাপ হাতে,—ঠাকুরপো, তোমার চা।

ধীরেশ তাকায় বৌদির দিকে। ফ্যাকাশে ম্লান মুখখানায় গভীর হতাশা আতংকের ছাপ।

মুখটা নীচু করে চায়ের কাপ হাতে নেয় ধীরেশ।

বলে,—বৌদি নাকি চলে যাচ্ছ?

সুবর্ণ দাঁড়িয়ে থাকে। কথা বলে না।

ধীরেশ জামাটা খুলে চায়ের কাপে চুমুক দেয়।

সুবর্ণ দাঁড়িয়েই থাকে।

ধীরেশের মনে কেমন যেন এক সংকোচ আসে। কোনখানে নিজের খানিকটা অপরাধ আবিষ্কার করে ফেলেছে ও। চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে মনটা সংকুচিত হয়ে ওঠে। মুখ তুলে ভাল করে কথা বলতে পারে না।

একবার বলে,—কখন যাবে?

সুবর্ণর গলা দিয়ে স্বর বেরোতে চায় না। কৃশ হাত দুটো কাঁপে। বলে,—বিকেলে।

ধীরেশ আর কিছু বলে না।

সুবর্ণ মাধুরীকে ডাকে,—আয়, চা খাবি আয়।

মাধুরী সুবর্ণর পেছন পেছন চলে যায়।

সেদিনও সুবর্ণই রাঁধে। মাধুরী সর্বক্ষণ সুবর্ণর কাছে কাছে থাকে। কথা বড় একটা বলে না।

শোভনা একবারও আসে না এদিকে।

সকলেই ভাত খায়। সীতেশ খায় না। বলে,—খিদে নেই।

শোভনাও নয়।

শোভনাকে সাধতে আসে ওরা।

সুবর্ণ বলে,—খাবে চলো ঠাকুরপো?

সীতেশ কথা বলে না।

সুবর্ণ সীতেশের হাতটা ধরে,—ঠাকুরপো, চলো।

সীতেশ শুধু বলে,—আমার ভাল লাগছে না বৌদি।

মাধুরী বলে,—কাল তো আর দিদি রাঁধতে আসবে না। আজ দিদি রেঁধেছে। খাবে চলো।

সীতেশ তাকায় সুবর্ণর দিকে।

ম্লান রক্তহীন ঠোঁট দুটো বেদনায় ভরা সুবর্ণর।

সীতেশ ওঠে বলে,—চলো!

সুবর্ণ ভাত দেয় ওকে।

খেতে খেতে সীতেশ তাকায় সুবর্ণর দিকে,—একটা কথা বলব বৌদি?

—কি?

—দাদা না হয় যাচ্ছে যাক। তুমি থাকো না!

সুবর্ণ মুখ ফেরায় অন্য দিকে।

সীতেশ নিজেই জানে না কতখানি অসম্ভব কথা বলছে ও।

—কই বলো?

সুবর্ণ কথা বলতে পারে না। ঘর থেকে বেরিয়ে যায় শুধু।

সীতেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উঠে পড়ে।

বিকেলে বীরেশ গাড়ি ডেকে আনে একটা। জিনিসপত্রগুলো তোলা হয়।

ধীরেশ বাড়ি নেই। সুবর্ণ মেয়েটাকে কোলে নেয়। ছেলেটার হাত ধরে।

বীরেশ সীতেশের ঘরের দিকে যায়।—সীতেশ!

ডাকে সীতেশকে।

কোন সাড়া নেই। সীতেশের ঘর বন্ধ। সীতেশ দোর খুলবে না। শোভনাও নয়।

বীরেশ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে।

মাধুরী ওদের পেছন পেছন আসে।

গাড়িতে ওঠবার আগে মাধুরী প্রণাম করে ওদের।

চোখ মুছে সুবর্ণকে বলে,—আমাকে ভুলো না দিদি!

সুবর্ণ কথা বলতে পারে না। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে চোখ দুটো ওর ঝাঁপসা হয়ে আসে।

কতটুকু বয়সে বিয়ে হয়ে এ বাড়িতে এসেছিলো। তখন তো শাশুড়ী বেঁচে।

তখন কে জানত যে একদিন এমন করে এ বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে।

মাধুরী তাকিয়ে দেখে গাড়িটা চলে গেল।

কাগজের টুকরোয় বীরেশের লেখা ঠিকানাটা নিয়ে চলে আসে।

বাড়ির ভেতরে ঢুকেই বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

সীতেশের দোর তখনও বন্ধ।

নিজের ঘরে গিয়ে বিছানার ওপর শুয়ে পড়ে মাধুরী।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

একটা ঠেলা খেয়ে মাধুরী উঠে বসে।

শোভনা এসেছে ওর ঘরে।

বলে শোভনা—কখন গেল?

মাধুরী গম্ভীর হয়ে থাকে। কথা বলে না।

শোভনা শুধোয় আবার।—ওরা কখন গেল মেজদি?

—কেন, তুমি জানো না?

শোভনা বলে,—আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—ছোটঠাকুরপো কি কোচ্ছিল?

শোভনার মুখটা এবার গম্ভীর হয়। ঠোঁট দুটো উল্‌টে বলে,—কি জানি।

মাধুরী বলে,—এই তো একটু আগে গেলো ওরা। কি রান্না হবে এবেলা?

—আমি কি করে বলব?

—তুমি ছাড়া আর কে বলবে? রান্না করবে কে?

শোভনার চোখে মুখে একটু লজ্জার ভাব দেখা যায়। বলে,—আমি তো কখনও রাঁধিনি মেজদি?

মাধুরী একটু হাসে,—এখন তো শিখতে হবে। আমিও কি রেঁধেছি নাকি!

শোভনা একটু ভেবে বলে,—তার চেয়ে একটা বামুন রাখো না!

—হ্যাঁ, বামুন দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে, ডাকলেই আসবে!—হাসে মাধুরী।

শোভনাও হাসে।—দেখতেও হবে তো!

মাধুরী বলে,—হ্যাঁ, দেখতে দেখতে যদি একমাস লাগে, সে একমাস তো আমাদেরই চালাতে হবে।

শোভনা মুখ টিপে হেসে বলে,—সে একমাস না হয় তুমিই চালিও না মেজদি।

—সে আমি বুঝেছি! তুমি বাবা কম চালাক নও। সেটি হবে না। রাঁধব আমি কিন্তু তোমাকে ধরে এনে রান্নাঘরে আমার পাশে বসিয়ে রাখব।

হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে শোভনা—কেন?

—রান্না শিখবে।—বলে মাধুরীও হাসে।

একটু সময়েই ওরা সহজ হয়ে আসে। আশ্চর্য সংসার। একটু আগেই যেখানটা ফাঁকা মনে হচ্ছিল, সে জায়গাটা কখন কোন ফাঁকে যে ভরে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, ওরা টেরও পায় না।

দু চার দিনের ভেতর সীতেশও সহজ হয়ে আসে কিছুটা। শুধু এক সুতীব্র অভিমান বুকে চেপে থাকে। দাদা ওকে ছেড়ে চলে গেল। তার এক সামান্য দোষে এমন করে তাকে একা ফেলে রেখে গেল! দাদার ওপর অভিমানের তীব্রতা ওর এত বেশী মনে হয় যে কথাটা ও কিছুতেই ভুলতে পারে না। বীরেশের চরিত্রের একটা দিকও যদি বুঝত সীতেশ, তবে আজ দেখতে পেত, বীরেশ যা করেছে, ঠিকই করেছে। এ ছাড়া আর কিছু করবার উপায় ছিল না ওর।

দেখতে দেখতে সীতেশের মনের অভিমানটা বিদ্বেষের ভাব ধরে। মনের অবচেতনে দাদার ওপর শ্রদ্ধাটা হয়তো ওর কিছুমাত্র কমে না, কিন্তু সজ্ঞানে ওর বীরেশের ওপর এক বিদ্বেষের ভাব আসে মাঝে মাঝে। নাকে ও এই

বলে ঠকাতে চায় যে দাদার ওপর ওর কোন টান আর নেই। দাদা ওর কোনদিন কিছু করে নি। দাদাকে না হলে ওর বেশ ভালই চলে। এইটে জোর করে বিশ্বাস করতে চেষ্টা করে ওর বিদ্বেষটা মাঝে মাঝে মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

শুধু তাই নয়। শোভনাকেও ও আর সহ্য করতে পারে না।

কারণে অকারণে তীক্ষ্ণ কথায় বেঁধে ওকে। কারণটা নিজেই বোঝে না। শোভনার ওপরই বা ওর এত তীব্র-বিরাগের কি কারণ। ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তবু এটা ও বেশ টের পায় যে শোভনাকে দেখলেই ওর স্নায়ুগুলোয় এক জ্বালা ধরে।

সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে শোভনা এগুলো সয়ে যায় হাসিমুখে।

খেতে বসেছে ওরা সবাই। ধীরেশ সীতেশ।

পরিবেশন করছে মাধুরী।

মাছটা দিয়ে বলে মাধুরী হেসে,—আজকের মাছটা কে রেঁধেছে জানো ঠাকুরপো ?

সীতেশ মুখ তোলে,—কে ?

—বলোনা কে ?

ধীরেশ বলে,—খেতে কিন্তু বড় সুন্দর হয়েছে। বৌমা রেঁধেছে বোধহয়। দাও দিকি আর একখানা মাছ।

শোভনার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে হাসিতে। রান্নার প্রশংসায় যে এত আনন্দ লুকিয়ে থাকে এ কথা যদি শোভনা জানত, তবে অনেক আগেই ও রান্না শিখত।

মাধুরীকে বলে,—মেজদাকে দাওনা আর দুটো মাছ।

—আর যে মাত্র দুটোই আছে। আমরা খাব না। তোমার মেজদা খেলে তো আমার পেট ভরবে না।

শোভনা বলে,—তা হোক, আমার ভাগ থেকে দাও।

নিজে না খাওয়াতে যে এত ভাল লাগে এও শোভনা আগে জানত না। সংসারে নোতুন স্বাদ পায় শোভনা।

মাধুরী ধীরেশকে মাছ দেয় সে—না—না করা সত্বেও।

সীতেশকে বলে,—কই কেমন লাগল ঠাকুরপো? কিছু বললে না তো?

শোভনা লজ্জিত মুখে তাকিয়ে থাকে সীতেশের দিকে।

সীতেশ শুধু বলে,—খুব ঝাল।—একটু বাঁকা হেসে বলে,—যার মনে ঝাল তার রান্নায় ঝাল হওয়া আর বিচিত্র কি বৌদি।

মাধুরী খিল খিল করে হেসে ওঠে।

শোভনার মুখখানা সাদা হয়ে যায়। আস্তে আস্তে সরে যায় ও ওখান থেকে।

সীতেশ মাছ খানিকটা ফেলেই ওঠে।

রাত্তিরে শোভনা এসে যখন শোয় সীতেশ তখন প্রায় ঘুমে।

শোভনা ঘরে ঢুকে দুধের বাটিটা বার করে রাখে। একটু সুপুরী এলাচ মুখে দেয়। পরদিন সকালের চায়ের কেটলী চা চিনি সব ঠিক করে গুছিয়ে রাখে। সকালের দিকের সব কাজ তো ওরই করতে হবে। ভাবতে ওর ভারি ভাল লাগে। দায়িত্বের নোতুন স্বাদ।

বালিশের ওয়াড় খুলে রাখে। কাল সাবান দিতে হবে।

তারপর সীতেশের পাশে এসে শুয়ে পড়ে।

সীতেশের গায়ে নাড়া দেয়,—শুনছ? ঘুমুলে নাকি?

সীতেশ পাশ ফিরে শোয়।

—শুনছো?

—আঃ!—বলে সীতেশ আবার পাশ ফেরে।

শোভনা সীতেশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে খানিক্ষণ। মুখখানি যেন অসহায়। কারো ওপর যেন নির্ভর করতে চায় সংসারে।

কপালের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দেয় শোভনা।

সীতেশ চোখ মেলে,—বলে গম্ভীর স্বরে,—ঘুমোও। আলো নিভিয়ে দাও।

—না ঘুমুব না,—কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করে শোভনা।

—তবে কি করবে?—সীতেশের কণ্ঠে বিরক্তি।

—গল্প করব। এ মাসে কিন্তু একটি জালের ছোট 'সেফ' না কিনলে হবে না। মিষ্টি খাবার রাখতে বড় অসুবিধে। আর তোমার দুটো গেঞ্জি।

—আমার গেঞ্জির খবরে তোমার কি দরকার ?

শোভনা হাসে,—তা আর নয়। সপ্তাহে দুবার করে সাবান তো দিতে হয় আমায়।

সীতেশ বলে,—রাতদুপুরে ওসব বাজে কথা রাখো। ঘুমুতে দাও।

সীতেশ পেছন ফিরে শোয়।

শোভনা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

তারপর বলে—ঝালের কথা আজ বলছিলে। ঝালটা তো তোমার কম দেখছিনে।

সীতেশ তক্ষুনী উত্তর দেয়,—তোমার কাছেই শেখা।

রাগে শোভনার নাকের পাতা দুটো ফোলে, বলে,—তোমার শিক্ষার এখনও অনেক বাকী।

সীতেশ কথার উত্তর দেয় না।

শোভনা নিজের মনেই ফুলে ফুলে আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড়ে।

অনেক্ষণ ঘুম আসে না।

চিরকেলে তেজী মেয়ে শোভনা। রূপবতী ঝাঁজালো মেয়ে শোভনা। এখনও মাঝে মাঝে বেসামাল হয়ে পড়ে। তবু কোথায় যেন ভারী নরম মধুর এক আবরণে ধীরে ধীরে চাপা পড়তে থাকে ওর চোখ ধাঁধানো রূপ। ওপরে তার এক মিঠে লাবণ্যের প্রলেপ পড়ছে যেন। সীতেশকে মানতে হয়। ইচ্ছে হয় সীতেশের বিশাল বুকখানার ভেতর লুকিয়ে পড়তে।

বড় গোপন ইচ্ছে। সবগুলো ইন্দ্রিয়ের তীব্রতা দিয়ে অনুভব করে শোভনা এই ইচ্ছে।

তাই আজও অনেক ভাববার পর ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে নরম মধুর হয়ে আসে ওর মনের ভাবগুলো। ও ধীরে ধীরে সীতেশের বুকের ভেতরে মুখটা গুঁজে দিয়ে আনন্দ পায়।

সীতেশ কিছু হয়ত বা টেরও পায় না গভীর ঘুমের ভেতর।

শুধু ভোরে ঘুম ভেঙে সীতেশ ওকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে উঠে যায়।

দিনগুলি এমনি করেই কাটতে থাকে। বীরেশেরও। সুবর্ণর কাছেই এনে দেয় বীরেশ যা পায় অপিস থেকে। এখনও সীতেশের বিয়ের সময় যে ঋণ করতে হয়েছিলো, সেটা মাসে মাসে শোধ হচ্ছে। তাই যা পায়, তাতে কোনমতেই চলতে চায় না। অপিসের টিফিন বন্ধ করতে হয়। ছেলেমেয়ের দুধ কমিয়ে দিতে হয়। তাতেও যখন কুলোয় না, তখন সুবর্ণ নিজের ওপর দিয়ে অভাবটা পুরণ করবার চেষ্টা করে। রাত্রের দিকে নিজে আর খায় না।

মাসের শেষের দিকে অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে।

বীরেশ অপিস থেকে এসে হাত মুখ ধুয়ে গীতাখানা খুলে নিয়ে বসে।

চোখেমুখে এক দৃঢ়তার ছাপ। গভীর হয়ে আসে দৃষ্টি।

রাত হয়ে আসে।

সুবর্ণ এসে বসে পাশে। খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে। মেয়েটাও।

বলে বীরেশকে,—এসে অবধি ওদের ওখানে গেলেও না?

বীরেশ মুখ তোলে। কথা বলে না।

—কাল যাবে? চলো না? শনিবার আছে, সকাল-সকাল অপিস থেকে এসে ওদের ওখানে চলো।

বীরেশ একটু হেসে বলে,—ওরাও তো আসেনি। তাছাড়া আমার ভাল লাগে না কোথাও যেতে।

সুবর্ণ সাড়ীর আঁচলটা দিয়ে গা'টা জড়িয়ে নিয়ে বলে,—বলেছো ঠিকই, ওরা তো একদিন এলোও না।

ছোট্ট ঠাকুরপো কিন্তু এরকম ছিল না। বিয়ের পর থেকেই—।

বীরেশ বলে,—কেন, ও তো এখনও কিছু খারাপ হয়নি।

—ও কেন খারাপ হবে। শোভনাই তো যত কিছু বাধালে।

বীরেশ আবার বলে,—ছোট বৌমা মেয়ে খুবই ভাল তারই বা দোষটা কোথায়?

সুবর্ণ জ্বলে ওঠে,—তবে কি সব দোষ আমার?

বীরেশ ওর রাগ দেখে হাসে, বলে,—না, আমার।

সুবর্ণ বলে,—তোমার মত মানুষ আর দুটো দেখলুম না। এত কাণ্ড করলে। এত অপমান করলে। তবু বলছ, ছোট বৌমা ভাল, ছোট ঠাকুরপো ভাল। দুনিয়ার একটা খারাপ লোকের নাম বলোতো আমার কাছে।

বীরেশ ধীরে ধীরে বলে,—তুমি ঠিকই বলেছ সুবর্ণ, মানুষ তো খারাপ নয়। নানা অবস্থায় পড়ে নানা ব্যবহার করে ফেলে ; চলো, খাবার কিছু আছে ?

সুবর্ণ মুখটা নীচু করে বসে থাকে।

—কি হোল, চলো।

সুবর্ণ মুখটা নীচু করেই বসে থাকে।

বীরেশ একটু হেসে বলে,—এক গেলাস জল দাও।

সুবর্ণ মুখ তোলে, ওর চোখ দুটো তালশাঁসের মতো রক্তহীন সজল,—মাসের শেষে দু চারটে দিন আর কিছুতেই সামলাতে পারিনা।

বলতে বলতে কেঁদে ফেলে।

বীরেশ এতটুকু টলে না। স্বর একটুও কাঁপে না। বলে,—তবু তো তুমি দু'চারটে দিন বলছ। আমার তো মনে হয় যা দিই, তাতে মাসের শেষে পনেরো দিন একবেলা খাওয়া উচিত। তুমি কি করবে সুবর্ণ ?

সুবর্ণ কাঠের মতো বসে থাকে।

—কই, এক গেলাস জল দাও।

শুধু জল সুবর্ণ কি করে বীরেশের হাতে তুলে দেবে। ও কিছুতেই পারবে না। তেমনি বসে থাকে সুবর্ণ।

বীরেশ বোধ করি বুঝতে পারে। এক গেলাস জল নিজে হাতে গড়িয়ে নিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়ে।

সুবর্ণ শুয়ে পড়ে।

ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে বলে,—কাল সকালে কি হবে ?

বীরেশ চুপ করে থাকে।

সুবর্ণ হঠাৎ বলে,—দেখো, মাঝে মাঝে আমার বুকের ভেতরটা কেমন করে।

বীরেশ আস্তে আস্তে বলে,—অত ভাবো কেন? কাল সকালের আট আনা পয়সা আছে আমার পকেটে।

ব্যস্, আর ভয় কি?

স্নুবর্ণ বীরেশের কাছে সরে আসে। বীরেশের গায়ের চাদরটা চেপে ধরে বলে,—দেখো, আমার কেমন ভয় ভয় করে।

—কিসের ভয়?

—কি জানি তা তো জানি না। ভয় ভয় করে বড্ড।

—তুমি বড় ভীতু স্নুবর্ণ।—ফিস্ ফিস্ করে বলে বীরেশ,—দেখো, সংসারে এই কঠোর দিনগুলোকে কখনও ভয় করতে নেই। কি আর হতে পারে বলো, কষ্ট দুঃখ এগুলো বড় জোর মেরে ফেলতে পারে। তার বেশী তো নয়। মরতে তো হবেই স্নুবর্ণ। ভয় পেয়ে প্রতি মুহূর্তে না মরে একদিন মরাই ভাল। ভয়ের চেয়ে পাপ আর নেই। ভয় পেয়ো না স্নুবর্ণ।

স্নুবর্ণ এক মনে কথাগুলো শোনে।

বীরেশের অনমনীয় মনের অভয়ের ছোঁয়া লাগে যেন ওর মনে। ও ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে। বীরেশ জেগে থাকে। জেগে থাকে অনেক রাত।

·

দিন চার পাঁচ পরেই মাইনে পায় বীরেশ। স্নুবর্ণর কাছেই এনে দেয়। স্নুবর্ণ বীরেশের হাতে চারটে টাকা দিয়ে বলে,—তোমার একটা জামা কিনে এনো। জামাটা একেবারেই ছিঁড়ে গেছে।

বীরেশ হেসে ফেলে,—আর তোমার সাড়ীটা?

স্নুবর্ণ কথা বলে না।

চলে যেতে চায়।

বীরেশ ডাকে,—শোন। টাকা চারটে রাখ। জামা পরের মাসে দেখা যাবে।

—ওই জামা পরে কি মানুষ অপিস যেতে পারে।

—খুব পারে।

—না, একটা জামা কেনো, ওদের সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়। ওরা কি ভাববে ?

—কাদের সঙ্গে ?—বীরেশ হেসে ফেলে,—ধীরেশ সীতেশ ? ওরা ভাববে দাদার জামা কেনবার পয়সা নেই।

—না, পয়সা তো রয়েছে।

বীরেশ হাসতে হাসতে বলে,—এ সব ভাবগুলো ছাড়তে হবে সুবর্ণ। সত্যি অবস্থাটা ঢাকবার চেষ্টা করলে আরও মরতে বসবে।

সুবর্ণ বলে,—তুমি নাও না টাকা। আমি টাকা এ মাসে পাব।

—কোথেকে পাবে ?

—শুনলে রাগ করতে পাবে না কিন্তু !

—বলো।

—ওই কোণের ঘরে যে মুড়ীউলী থাকে, ওর সঙ্গে বসে ঠোঙা তৈরী কোরব। ও বলেছে।

বীরেশ গম্ভীর হয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

—কই কিছু বললে না তো ?

বীরেশ কিছুক্ষণ পরে বলে—যা ভাল বোঝ করো। কিন্তু আমি ভাবছি।

—কি ?

—তোমার শরীরে পোষাবে কিনা ?

সুবর্ণ হাসতে হাসতে বলে,—তুমিই তো বলেছ, মরতে তো একদিন হবেই।

বীরেশ হাসতে থাকে,—তাই বলে ইচ্ছে করে শরীরের ওপর অত্যাচার না করাই ভাল।

সুবর্ণ হাসতে থাকে।

একটু পরে বলে,—শোন, খোকা বলছিল, ছোট কাকার কাছে যেতে ইচ্ছে হয়। ও আবার ছোটঠাকুর পো'র খুব ন্যাওটা ছিল তো ? আজ পাঠাব ?

—পাঠাও। ট্রাম রাস্তাটা দেখে যেতে বোলো।

—এই কাছেই তো।

বলে স্থবর্ণ রান্নাঘরে চলে যায়।

বীরেশ স্নান করতে ওঠে। অপিসের বেলা হোল।

বিকেলে খোকা সীতেশের কাছে চলে আসে। সীতেশ ঘরে চুপ করেই বসেছিল। শোভনা ওকে শুধোচ্ছিল,—কড়াইশুটীর কচুরী করে দোব? জলখাবার?

সীতেশ কথা বললে না প্রথমে।

অনেকবার শোভনা যখন বললে, তখন উত্তর দিল, তোমার যদি খেতে ইচ্ছে হয়, করতে পারো।

শোভনা হাসে, বলে,—তার মানেই আমার নাম করে তোমার খেতে ইচ্ছে হয়েছে।

সীতেশ চুপ করে একখানা বই হাতে তুলে নেয়।

শোভনা কোমরে সাড়ীর আঁচল জড়িয়ে স্টোভ ধরায়। ময়দা মাখে। কড়াইশুটী বেটে নিয়ে আসে।

সীতেশ মাঝে মাঝে তাকায় শোভনার দিকে। কয়েক মাস আগে হলে সীতেশ শোভনার এমন রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত। সত্যিই অপরূপ দেখাচ্ছিল শোভনাকে। সবুজ সাড়ীখানা গাছকোমর বাঁধা। সাদা সুডোল হাত দুখানায় শুধু দুগাছা রুলি। কপালের সিঁদুরের টিপটি আধুলার মত বড়। স্টোভের আভায় মুখখানা রাঙা। বড় বড় চোখদুটোয় যেন তৃপ্তির স্বাদ।

আজ কিন্তু সীতেশের ভাল লাগে না। বীরেশের চলে যাবার পর শোভনার সব কাজে এমন উৎসাহ আর এত যত্নই সীতেশের যেন সব চেয়ে খারাপ লাগে। সবেতেই বাড়াবাড়ি সুরু করেছে শোভনা, যেন মনের পাখা ওর খুলে গেছে মুক্ত বাতাসে। বীরেশ কি তবে শোভনার এতই অবাঞ্ছিত হয়ে ছিল এখানে। ভাবতেই গায়ে জ্বালা ধরে সীতেশের। প্রতিটি কাজে প্রতিটি কথায় শোভনা সীতেশকে যেন টেনে খুব কাছে নিতে চায়। গেঞ্জি বালিশের ওয়াড় কাচা থেকে সুরু করে বিকেলে সীতেশকে যত্ন করে খাবার করে দেয়। আর রাত্রে সোহাগে তার বুকের ওপর এলিয়ে পড়া। সবই শোভনার গোপন প্রাণভরা ভালবাসাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এতদিনে

যেন সীতেশ শোভনাকে স্ত্রীর মত পেয়ে যায়। কিন্তু এইটেই সব চেয়ে খারাপ লাগে।

এর চেয়ে বোধকরি শোভনা যদি আগের মতোই কঠোরা নিষ্ঠুরা থাকত। সীতেশকে গ্রাহ্য না করত। তাতে বোধহয় সীতেশের মনে এ তিক্ততা আসত না।

দেখতে দেখতে বিরক্তিতে রাগে সীতেশের শরীরটা শির শির করে ওঠে। বইয়ে মুখ রাখে সীতেশ। শোভনা তখন কচুরী ভেজেছে দুখানা।

ঠিক এই সময়েই খোকা এসে ঘরে ঢোকে।

—ছোটকাকা আমি এসেছি।

সীতেশ ওকে একবার টেরিয়ে দেখে নিয়ে বইয়ে চোখ রাখে আবার।

শোভনা হেসে বলে,—আয়, কচুরী খাবি? বোস।

বলে ওর হাতে দু'খানা কচুরী তুলে দেয় শোভনা।

খোকা মুখের কাছে নিয়ে দুবার ফুঁ দিয়ে খেতে যাবে এমনি সময় হঠাৎ সীতেশ বিদ্যুদ্বেগে উঠে খোকার হাত থেকে কচুরী দুটো ফেলে দিয়ে বলে ওঠে,—লজ্জা করে না! বেরো। বেরো ঘর থেকে।

ঘাড় ধরে বার করে দেয় ওকে।

শোভনা স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে।

মাধুরী ছুটে এসে খোকাকে নিয়ে তার নিজের ঘরে চলে যায়।

সীতেশ হাঁপিয়ে ওঠে। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আবার বইটা হাতে তুলে নেয়।

শোভনার মাথার তালুটা জ্বলে ওঠে।

স্টোভটা নিভিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মাধুরীর ঘরে এসে শোভনা খোকাকে কোলের কাছে টেনে নেয়। খোকার মুখখানা লাল। চোখ দুটো বেয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ে। বলে, —আমি বাড়ি যাব।

শোভনা ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলে,—খুব লেগেছে নারে?

খোকা বলে,—বাড়ি যাব!

মাধুরী মিছরী দেয় ওকে, এক গেলাস জল দেয়।

খোকা জল খায় না।

মিছরীটা নিয়ে চলে যায়।

বাড়িতে এসে দেখে বীরেশ এসেছে।

খোকা কাঁদতে কাঁদতে বীরেশের কানের কাছে গিয়ে বলে,—বাবা, মেরেছে।

—কে মেরেছে রে?

সুবর্ণ চাল নিচ্ছিল রাত্রের রান্নার। ফিরে তাকায়।

খোকা শুধু চোখ মোছে।

বীরেশ আবার শুধোয়,—কে মেরেছে?

—ছোটকাকা।

সুবর্ণ তাড়াতাড়ি ছেলের কাছে ওসে ছেলেকে কোলে নেয়। ওর গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসে লাল হয়ে উঠেছে।

বলে ওঠে,—মাগো! ছেলেটাকে কেমন করে মেরেছে!

বীরেশ চুপ করে থাকে।

সুবর্ণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খোকাকে সব শুধোয়। দু'খানা কচুরী নিয়েছিলো বলে মেরেছে।

শুনে সুবর্ণর বুকটার ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে,—কচুরী কি কখনও খেতে পাস না হতভাগা!

বলে ছেলেকে আরও দু ঘা বসিয়ে চোখ মোছে।

বীরেশ চুপ করে সব দেখে।

সুবর্ণ চোখ মুছতে মুছতে বলে এবার বীরেশকে,—যাও, তাহোলে গিয়ে কিছু বলে এসো। কেন সে এতবড় অন্যায় করবে!

বীরেশ ধীর স্বরে বলে,—তুমি মিছিমিছি রাগ কোরছ সুবর্ণ। ও নিশ্চয়ই কিছু দোষ করেছিল, তাই শাসন করেছে। সীতেশ মিছিমিছি মারবার ছেলে নয়।

খোকা বলে,—আমি কিচ্ছু করিনি, বাবা।

বীরেশ ঘাড় নেড়ে বলে,—উঁহু, নিশ্চয়ই তুমি কিছু করেছিলে, নইলে মারবে কেন ?

সুবর্ণ ছেলের হাত ধরে বলে,—চল রান্নাঘরে। তোকে আজই কচুরী করে খাওয়াব।

বলে ছেলেকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বীরেশ চুপ করে বসে থাকে। মনে মনে ওর বড় হাসি পায়।

রাত্রে শুতে এসে শোভনা দেখে সীতেশ তখনও বসে একখানা বই পড়ছে। মুখটা অস্বাভাবিক গম্ভীর ওর। ছেলেটাকে মারবার পর থেকে অনুতাপে ওর বুকটা জ্বলে যাচ্ছে, তবু কাউকে তো কিছু বলবার উপায় নেই। শুধু চুপ করে থাকা, এ ছাড়া সীতেশ আর এখন কিই বা করতে পারে। যখনই ভাবছে খোকা গিয়ে দাদাকে সব বলবে, দাদা কি ভাববে। ততই সীতেশের মনটা তিক্ততায় আতংকে ভরে উঠছে। তবু খোকাকে না মেরে তো সীতেশ পারল না। কিছুতেই সে পারল না। শোভনা আজ আদর করে খোকাকে দুটো কচুরী দেবে, আর সেই কচুরী খোকা খাবে, এযে সে কিছুতেই হতে দিতে পারবে না।

শোভনা আলোটা নিভোতে গিয়ে শুধোয়,—আলো নিভোব ? শোবে না ?

সীতেশ মুখটা একবার তুলে বলে,—না।

শোভনা এসে পাশে বসে, নরম স্বরেই বলে,—কি হোল বলোত তোমার ?

কিছু না।—বলে সীতেশ।

কি আরম্ভ করেছ তুমি ?—শোভনার কণ্ঠে বেদনা।

সীতেশ মুখটা তুলে বলে,—আরম্ভটা তুমিই করেছ। আমি শেষ করেছি মাত্র।

শোভনা বলে,—আমি কি আরম্ভ করেছি শুনি ?

সীতেশ গম্ভীর স্বরেই বলে,—তুমি বুদ্ধিমতী শোভনা। এ কথাটা তোমায় না বলে দিলেও বোধকরি বুঝতে পারবে। বুঝতে পারছ না বলে মনে হয়।

সত্যি বুঝতে পারছি না তোমার কাছে কি আবার অন্যায় করেছি।

সীতেশ চুপ করে থাকে।

শোভনা সীতেশের গা ঘেঁসে বসে।

সীতেশ বলে,—সরে বোস।

শোভনা আহত হয়,—আজকাল কি আমার স্পর্শ সহ্য করতেও পারো না।

সীতেশ কথা বলে না।

—স্পষ্ট করে বললেই হয় সে কথা।

সীতেশ তবুও কথা বলে না।

শোভনা বলে,—সত্যি আমি হাঁপিয়ে উঠছি।

সীতেশ বইয়ে মুখ রেখেই জবাব দেয়,—তোমার চেয়ে বেশী হাঁপিয়ে উঠছি আমি।

—একটা কথা রাখবে?

—কি?

—ভেতরে যাই-ই করো, বাইরের কারো সামনে এমন করে আমার অপমান কোর না।

—অপমান তো করিনি।

—আজকে যা করলে তাতে কি আর অপমানের কিছু বাকী থাকে!

—আমি নিজেকেই নিজে অপমান করেছি শোভনা, তোমাকে নয়।

কি ভেবে শোভনা চুপ করে যায়।

সীতেশ বইটা বন্ধ করে।

শোভনা আর কথা বাড়ায় না। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে এসে শুয়ে পড়ে।

সীতেশ দাঁড়ায়।

একটা সিগারেট ধরায়।

ঘরে পায়চারি করতে থাকে।

খোকাকে চড়টা মেরে খোকাকে যতটা ব্যথা দিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যথা লেগেছে ওর নিজের। সমস্ত রাতটা হয়ত বা তাকে এমনি করে ছট্‌ফট্ করেই কাটাতে হবে।

শোভনা কিছুক্ষণ জেগে থাকে। একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।

মাস দেড়েক পরে খবর আসে শোভনার দাদার খুব অসুখ। খবরটা এনেছিল বাড়ির এক চাকর। শোভনা শুধোলে, কি অসুখ রে?

চাকরটা রোগের নাম বলতে পারলো না।

বললো,—খুব অসুখ। একবার যেতে বলেছে আপনাকে।

শোভনা গুম্ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। দাদার মুখখানা মনে পড়ল বারবার। সঙ্গে সঙ্গে বৌদির মুখটাও। বৌদির ব্যবহারও।

বললে,—বৌদির কাছ থেকে চিঠি নিয়ে আসবি। কি অসুখ যেন লিখে জানায়।

বলে বিদায় করলে চাকরকে।

বৌদি একমাত্র যেতে বললে যেতে পারে সে। চাকরের কথায় যাবে না।

দাদার এমন অসুখের সময় অভিমান করাটা কি ঠিক হচ্ছে? মনে হোল একবার। আবার মনে হোল কেনই বা যাবে সে। বিয়ের পর থেকে সে-ও যেমন যেতে পারে নি, দাদাও তো একবারও লোক পাঠায় নি নিতে। একটা খবরও দেয়নি। বোর্ডিংয়ে থাকতে তবু যাতায়াত ছিল। এ বাড়ি এসে সেটুকুও গেছে। শোভনার মনে হওয়াটা কিছুই বিচিত্র নয় যে তারা বেঁচে গেছে শোভনার বিয়ে দিয়ে। বয়স্থা বোনকে বিয়ে দিয়ে দায়িত্ব থেকে খালাস হয়েছে।

তবু শোভনার মনটা বড়ই দমে যায়। দাদার খুব অসুখ না হলে হয়ত বা খবর দিত না। একবার যাওয়া উচিত ছিল।

সীতেশ স্কুল থেকে ফেরবার পর একবার শুধোয় শোভনা,—শুনেছ, দাদার অসুখ।

সীতেশ মুখ তোলে,—কে বললে?

—ও বাড়ির চাকর এসেছিলো। খবর দিলে।

—অ।—বলে সীতেশ জামা ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে আসে।

সীতেশের জলখাবার নিয়ে এসে আবার কথাটা পাড়ে শোভনা,—খুব অসুখ না হলে কি আর খবর দিত?

সীতেশ কথা বলে না।

—তুমি কি বলো, একবার যাওয়া উচিত?

সীতেশ মুখ তোলে,—আমার মত শুনতে চাইছ?

—হুঁ। তোমার কি মনে হয়। আমিতো কিছু বুঝতে পারছি না।

সীতেশ স্পষ্ট করে বলে,—আমার মনে হয় যাওয়া উচিত নয়।

শোভনা ঠিক এমন উত্তর আশা করেনি। একটু অবাক হয়। বলে,—কেন?

সীতেশ একটু হাসে,—দাদাদের ওপর ভালবাসার টান না রাখাই ভাল।

সীতেশ খোঁচাটা যে কোথায় দিয়েছে কিছুটা টের পায় শোভনা।

বলে,—টান কি যায়। দূরে থাকলেও মনের টানটা রাগ হয়ে দেখা দেয়।

খোঁচাটা এবার লাগে সীতেশের।

বলে,—তাছাড়া আমার এক বন্ধু আসছে। তোমার তো যাওয়া এখন চলতে পারে না।

শোভনা বলে,—তোমার বন্ধু এলে আমার কিছু আসে যায় না।

সীতেশ চটে,—আমার আসে যায়।

শোভনা বেরোতে যায়।

—শোন।—ডাকে সীতেশ।

শোভনা ঘুরে দাঁড়ায়,—তুমি কি আমাকে তোমার দাসী পেলে নাকি?

সীতেশ ওকথার জবাব না দিয়ে বলে,—বৌদিকে বলবে তার ভাই সুধাকর কাল আসছে। চিঠি দিয়েছে।

শোভনার চোখ দুটো হঠাৎ বড় বড় হয়ে যায়,—সুধাকর! কে সে?

—মেজ বৌদির ভাই। আমার বিশেষ বন্ধু। বম্বে থেকে আসছে।

—বিয়ের পর থেকে তো শুনিনি এর নাম?

সীতেশ বলে,—তা শোননি। কারণ এর নাম ধাম কিছুই আমাদের মনে করিয়ে দেবার মতো কিছু ও করে না। হঠাৎ এসে উদয় হয়। একটু পাগলাটে আর কি!

শোভনা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

চিঠিটা পকেট থেকে বার করে দেয় সীতেশ।

মাধুরীকে দিতে হবে চিঠিটা।

শোভনার ভ্রুদুটো কুঁচ্‌কে ওঠে, কিসের এক ভাবনায়,—তোমার কতদিনের বন্ধু?

—বহুদিনের।—আর কিছু না বলে সীতেশ স্কুলের পরীক্ষার খাতা নিয়ে বসে।

শোভনা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সোজা রান্নাঘরে যায়। মাধুরী সেখানেই রয়েছে।

—মেজদি তোমার চিঠি।

হাসতে হাসতে চিঠিটা ছুঁড়ে দেয় শোভনা মাধুরীর দিকে।

—কার চিঠিরে!—চিঠিটা তুলে নেয় মাধুরী,—ওমা! এ যে খোলা। সুধা দা' লিখেছে! বাব্বা! এ্যাদ্দিন পর মনে পড়ল বোনকে।

শোভনা শুধোয়,—তোমার ভাই নাকি?

—হ্যাঁরে। তোকে তো বলা হয়নি। এ এক আমার পাগলা দাদা। এমন আপন ভোলা মানুষ আমি দেখিনি। হাজার হাজার টাকা রোজগার করে, অথচ একটু দেমাক নেই। একটু হিসেব নেই। দেদার আসচে, দেদার খরচা কচ্চে।

—অদ্ভুত লোক তো!

—হ্যাঁ, তাছাড়া টাকা সবই নিজের। রোজগারও নাকি অদ্ভুত উপায়ে করে। কি করে কেউ জানে না। কেন, ঠাকুরপোর তো বন্ধু।

শোভনা বলে,—তা বললে বটে! কিন্তু অত বড়লোক এলে বসাবে কোথায়? থাকবে কোথায়?

মাধুরীও যেন ভাবনায় পড়ে।—তাইতো ভাবছি। দেখি ঠাকুরপোকে শুধোই।

শোভনা হাসে,—কিন্তু শুধোবার দরকার নেই। ওঁকে দাদার ছোট ঘরটা ছেড়ে দিলেই হবে।

—তা দেয়া যায়। কিন্তু ওটা তো দাদা চলে যাবার পর থেকে ভাঁড়ার করা হয়েছে।

—ভাঁড়ার কাল সরিয়ে ফেলব। তোমার ঘরে কিছু, আর রান্না ঘরে কিছু।

মাধুরী বলে,—আর তোর ঘরে ?

শোভনা খিল খিল করে হাসে—আমার ঘরে কিছু নয়।

মাধুরী রেগে যায়.—সব তোর ঘরে ঢোকাব।

শোভনা আবার হাসতে যায়। কিন্তু হঠাৎ দাদার অসুখের কথাটা মনে পড়তেই হাসিটা বন্ধ হয়ে যায়। মাধুরীকে সব কথা বলে।

শুনে মাধুরী বলে,—তোর একবার যাওয়া উচিত।

শোভনা নিতান্ত চিন্তিত হয়ে যেন বলে,—তাই ভাবছি।

সীতেশের কথাগুলো তখনও ওর কাণে বাজছে।

মুখখানা ম্লান হয়ে আসে ওর, বলে—না, যাব না।

—কেনরে ?—শুধোয় মাধুরী।

—না।—বলে শোভনা। আরও গম্ভীর স্বরে।

তারপর চলে যায় ঘর থেকে।

ঘরে গিয়ে দেখে সীতেশ এর ভেতর বেরিয়ে গেছে। বোধহয় হেড্মাস্টারের বাড়ি।

চুপ করে বসে থাকে ঘরে। আগের কথা মনে হয় শোভনার। এই সীতেশ তখন থাকত কত নরম হয়ে, কত নীচু হয়ে। শোভনাকে একটু সন্তুষ্ট করতে পারলে খুশীর আর অন্ত থাকত না ওর। আর আজ? শোভনা যতই এগোচ্ছে, যতই কাছে টানতে চাইছে, ততই সীতেশ যেন পেয়ে বসছে ওকে। নানাভাবে বোঝাতে চাইছে যে সে খুশী নয়। সে চায় না কাছে পেতে শোভনাকে। তবে কি সীতেশ আগের দর্পিতা রূপসী শোভনাকেই ভালবাসত, আজকের মধুর আনত শোভনাকে ভালবাসতে পারছে না!

শোভনা জানালাটা ধরে দাঁড়ায়।

আকাশে অনেক অনেক তারা, ঠিক ওর মনের অসংখ্য চিন্তার মতো। কি করবে শোভনা। আবার কি সে অবজ্ঞা করতে পারবে সীতেশকে? না, সে যে আর পারবেই না। তার মনে কোথায় যেন ধীরে ধীরে এক পরিবর্তন এসে গেছে। ওর অবচেতন মনে বীরেশের শুদ্ধ মনের ছোঁয়া লেগেছে যেন। বীরেশের ব্যবহারের গভীরতা, কথার গভীর মাধুর্য কখন যে ওর মনে গভীর ছায়া ফেলে গেছে, ও নিজেও জানে না। তাই বুঝি বা জীবনকে আরও গভীর দৃষ্টিতে শান্ত মনে দেখবার চেষ্টা করছে ও। ও চাইছে বাইরের চঞ্চলতা কমিয়ে—নারী জীবনের প্রশান্ত ঠাণ্ডা ভাবগুলোর আস্বাদ নিতে। যতই স্বাদ, ততই মধুর। ভারি ভাল লাগছে ওর। তাই ভাল লাগার বিরুদ্ধে যাবার সাধ্য নেই শোভনার।

এ সইতেই হবে।

কিন্তু সইবার ধাত তো শোভনার নয়। হয়তো বা সইতে সইতে একদিন ফেটে পড়বে শোভনা নিজের রূপ নিয়ে। নিজের আপন তেজে। কে জানে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে ভারি ভাল লাগে ওর।

ভাবতে ভাল লাগে, এমনি করে আরও অনেক হাজার দিন কেটে যাবে। নিঃশেষ হয়ে যাবে সে এই বিরাটের ভেতরে। আরও হাজার দিন কেটে হাজার রাত হবে।

সে হয়তো থাকবে। কিন্তু এই শোভনা আর থাকবে না।

আগে এমন করে আকাশের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ভাবতে পারত না শোভনা। আজ কেন পারে? শুধু পারে না। ভাল লাগে।

নিজে অবাক হয় শোভনা।

সীতেশের পায়ের শব্দে চমকে ফিরে তাকায় শোভনা।

সীতেশ ফিরেছে।

ওকে দেখে বলে,—তোমার দাদার ওখান থেকে লোক এসেছে।

শোভনা চুপ করে থাকে।

—তোমার বৌদির চিঠি নিয়ে এসেছে। ধরো।

শোভনা ধীরে ধীরে চিঠিটা নেয়। আস্তে আস্তে ছিঁড়ে কুঁচি কুঁচি করে জানালা দিয়ে ফেলে দেয়।

সীতেশ এবার রীতিমত অবাক হয়,—ওকি, ছিঁড়ে ফেললে যে!

শোভনা বলে ধীর কণ্ঠে—বলে দাও। আমি যাব না।

শোভনা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে।

—একবার গেলে হোত।

—না।—আর একবার বলে শোভনা।

ওর গলার স্বরে সীতেশ যেন একটু ভয় পায়।

আর একবার বলে,—না হয় আমার সঙ্গেও যেতে পারতে।

সীতেশ বলে,—কই একটা উত্তর দেবে তো?

—না, যাব না।—খুব আস্তেই বলে শোভনা।

সীতেশ আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

শোভনার বুকটার ভেতর যেন কেমন করতে থাকে। কে জানে দাদা যদি না বাঁচে! এটা কি সে ভাল করলো।

কিন্তু এখন এ কথা বলা ছাড়া আর তো তার উপায় ছিল না। সীতেশকে তার এ কথা বলতেই হবে। যেতে সে পারবে না। মরে গেলেও না।

দাদার মুখটা মনে পড়ে।

আকাশের দিকে তাকায় শোভনা।

এত বড় আকাশেও তো তার মন ভরছে না আজ। কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। দাদার জন্যে তার মনে যে এতবড় একটা স্থান ফাঁকা ছিল এ কথা তো সে নিজেও আগে কখনও এমন করে জানে নি। কখনও এমন করে আবিষ্কার করে নি।

জানালার গরাদ দুটো ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেই হয়। ইচ্ছে থাকলেও আর যাবার উপায় নেই। মানুষের মনের এ এক মস্ত বড় তামাসা। কত বড় বড় কর্তব্য ভেসে যায় মনের এক একটা বিরাট ভাবতরংগের নির্মম আঘাতে। মনের ভাবগুলোর কি অসাধারণ শক্তি!

বীরেশের সংসারে যেন অভাবের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কিছুতেই কিছু করা যাচ্ছে না। এ যেন একহাত কাপড়ে চারহাত দেহ ঢাকবার এক হাস্যকর করুণ চেষ্টা। সুবর্ণর আপ্রাণ চেষ্টা দেখে বীরেশ না হেসে পারে না।

—মিছিমিছি চেষ্টা কোরচ সুবর্ণ! ওতে কষ্টই বাড়বে, লাভ হবে না কিছুই।

সুবর্ণ মুখখানা কালো করে হতাশ চোখদুটো তুলে বলে,—কি করি বলো তো?

বীরেশ হাসে,—কিছু না।

সুবর্ণ বীরেশের নির্বিকার ভাবে আহত হয়,—আবার আশ্চর্যও হয়। বলে—তুমি যে কি করে চুপচাপ থাক! আমি পারিনে কেন?

বীরেশ কাছে ডাকে সুবর্ণকে। বলে ফিসফিস করে,—একটা সত্যি কথা বলি সুবর্ণ। কথাটা জীবনে কখনও ভুলো না। মিছিমিছি হাত পা ছুঁড়ে দুঃখু করে ভেবে কেঁদে মানুষ কখনও তার আশা পূরণ করতে পারে না। আশা না করে কাজ করতে পারলে সব চেয়ে ভাল হয়। তা যদি নাও পারো কষ্ট পেয়ে হতাশ হয়ে যেও না। হাঁকপাঁক কোর না।

সুবর্ণ বড় বড় চোখদুটো মেলে তাকায় বীরেশের দিকে। কি প্রশান্ত, কি সুন্দর বীরেশের চোখদুটো! আহা কি গভীর! কুরূপা সুবর্ণ কি করে যে বীরেশের মতো স্বামী পেলো! এমন স্বামী পাওয়া কত সৌভাগ্য! সুবর্ণর চোখদুটো জলে ভরে আসে।

সুবর্ণ চোখভরা জল নিয়ে মাথা নেড়ে জানায়, না—না।

বীরেশ সুবর্ণর চোখের জল মুছিয়ে দেয় আজ।

বলে,—টাকা কি সব খরচ হয়ে গেছে?

সুবর্ণ মাথাটা নীচু করে ঘাড় নেড়ে জানায়—হ্যাঁ।

বীরেশ একটু ভেবে বলে,—পকেটে পাঁচটা টাকা আছে, নাও। আর যদি কিছু লাগে এনে দোব। ভাবছি—

সুবর্ণ শুধোয়—কি ভাবছ?

—ভাবছি, একটা দোকানে খাতা লেখার কাজ কোরব। একজন বলছে।

সুবর্ণ বলে,—না, তা হবে না। তোমার শরীরে সইবে না।

বীরেশ হাসে,—শরীরটা আমার মাখনের নয় সুবর্ণ। অনেক ঝড়জল গেছে এর ওপর দিয়ে। তুমি বরং—

—কি ?

—তুমি বরং ঠোঙা আর তৈরী কোর না।

সুবর্ণ বলে,—আর তো করি না।

—কেন ?

—মুড়ীউলী পয়সা দেয় না।

—সে কি ?

—হ্যাঁ, কত ঠোঙা করিয়ে নিয়েছে। পয়সা চাইতে গেলে বলে আজ দোব কাল দোব।

বীরেশ হোহো করে হেসে ফেলে,—বলো কি ? এমনধারা ?

—হ্যাঁ, দেখলে গা জ্বলে। কাজ করিয়ে নেবে। পয়সা দেবে না। কি সব মানুষ বলো তো ?

হেসে বলে বীরেশ,—একদিন খুব কষে ঝগড়া করো না।

সুবর্ণ চোখ বড় বড় করে বলে,—ওরে বাপ ! ওর মুখের সামনে দাঁড়াব আমি ? ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবে।

বীরেশ হাসতে থাকে।

খোকা কোত্থেকে ছুটতে ছুটতে আসে।

হাপাতে হাপাতে বলে,—বাবা, একটা বেলুন কিনব।

—বেলুন কেন ?

সুবর্ণ বলে,—না।

বীরেশ বলে,—আহা দাও না। চাইছে এতো করে। আমার পকেট থেকে দাও।

সুবর্ণ ওকে পয়সা দিয়ে বলে,—ছেলেটার মাথাও খেলে তুমি।

বীরেশ বলে,—ওর মাথা যদি থাকে তো কেউ খেতে পারবে না।

সুবর্ণর মনে পড়ে খোকাকে মেরেছিল সীতেশ।

হঠাৎ বলে,—আচ্ছা ঠাকুরপোরা তো একবার পথ ভুলেও আসতে পারে!

বীরেশের মুখটা সহসা গম্ভীর হয়ে ওঠে, বলে,—বোধহয় সময় পায় না। তা ছাড়া আমরাও তো যেতে পারি না।

সুবর্ণ বলে,—আমার যাবার কথা মনে হলেই বুকটা কেমন করে ভয়ে।

—কার ভয়ে?

—কি জানি। ও বাড়িটা দেখলে আমার কান্না পাবে। কতকাল ছিলাম। তাই তো যাই না। তুমি তো একবার গেলে পারো।

বীরেশ চুপ করে থাকে।

আবার বলে সুবর্ণ,—তুমি যাও না কেন?

—গেলেই হয়। দরকার পড়লে যাব বইকি!

—কবে দরকার পড়বে?

—তাকি বলা যায়। হয়তো দরকার পড়তেও পারে।

সুবর্ণ চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। কথা বলতে ভাল লাগে না কারো। সুরটা যেন কেমন কেটে গেলো হঠাৎ। সুবর্ণ উঠে বীরেশের পকেট থেকে টাকা পাঁচটা নিয়ে বাক্সে রাখে।

মেয়েটার কাছে বসে।

বীরেশ চুপ করে শুয়ে থাকে। ওর চিরকাল যেমন স্বভাব।

শোভনার দাদা মারা গেছে। খবরটা এলো পরদিন ভোরে। খবরটা দিতে হোল সীতেশকেই। সীতেশ খবরটা দিয়েই বললে,—চলো এখুনি একবার যেতে হয়।

শোভনা বললে—না।

বলবার ধরণটা ভারি কঠিন। সীতেশ আর কথা বলতেই পারলো না।

শোভনা কাউকে কিছু বললো না। কাঁদলো না।

সীতেশ সন্ধ্যায় আসতেই মাধুরী জানালো সব,—কি করি ঠাকুরপো। আমার তো ওর সামনে যেতে ভয় করছে। কেমনধারা পাথরের মতো হয়ে গেছে। কিছু খায় নি। কারো সঙ্গে একটা কথাও বলেনি।

সীতেশ শুনলো সব। মনে মনে শংকিত হোল, বিরক্তও হোল। যত দায় তার। কি জ্বালা যে হয়েছে।

শোভনার কাছে গিয়ে বসে।

শোভনা বিছানার ওপর আধশোয়া অবস্থায় ছিল। সীতেশকে দেখে উঠে বসে।

সীতেশ শুধোয়,—আজ কিছু খাও নি?

শোভনা সহজ ভাবেই বলে,—না।

সীতেশ জোর করে হাসতে চেষ্টা করে,—কেন?

শোভনা সীতেশের দিকে তাকায়, যেন ওর জোর করে হাসিটা ধরে ফেলেছে,—বলে,—ভাল লাগছে না।

সীতেশ কথা পায় এতক্ষণে,—ভাল লাগছে না বললে তো শরীর শুনবে না। শরীর রক্ষা করতে হবে তো। একদিনেই তো অর্ধেক হয়ে গেছো।

শোভনা ম্লান মুখে বলে,—বেশ, রাত্তিরে খাব।

সীতেশ কাছে আসে।

ওর পিঠে একটা হাত রাখে। পিঠের হাড়গুলো হাতে লাগে। শোভনা অনেকটা রোগা হয়ে গেছে।

হঠাৎ বলে,—চলো না একটু বেড়িয়ে আসি।

শোভনা কথা বলে না।

—যাবে? আজ অনেকদিন পর বেড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে তোমায় নিয়ে।

শোভনা তবু কথা বলে না। মুখ নিচু করে তেমনি বসে থাকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি ভেবে সীতেশ ওর মুখটা তোলে। চোখের জলে ওর গাল ভেসে গেছে। সীতেশের মনটা করুণ হয়ে ওঠে।

অনেকক্ষণ শোভনার মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে, আস্তে বলে,—আমায় ক্ষমা করো শোভনা।

শোভনা কান্নায় ভেঙে পড়ে আজ।

এত কান্না কাঁদতে এর আগে শোভনাকে কখনও দেখা যায় নি। এমন ছেলেমানুষের মতো শোভনা কাঁদতে পারে এ যে ভাবাই যায় না। মনে ওর বহুদিনের বাষ্প গলতে সুরু করেছে। নরম হয়ে গলে পড়ছে যেন শোভনা। মনের কাঠিন্য তরল হয়ে দেখা দিয়েছে। শোভনা কাঁদে।

সীতেশ শোভনার খুব কাছে গিয়ে বসে বলে,—তোমাকে ছাড়া আর কাকেই বা বলি।

শোভনা নীরবে বসে থাকে মাথাটা নিচু করে।

সীতেশ ওকে আরও কিছুক্ষণ সময় দেয় ভাববার কাঁদবার।

বুকটা ওর হালকা হয়ে যাক। মনের ভার নেমে যাক একেবারে।

জানালার বাইরে চোখে পড়ে আকাশ। নিকষ কালো আকাশ। তারার বিন্দুগুলো ভাল দেখাই যায় না যেন। বাতাস বইছে ঠাণ্ডা।

জানালাটা বন্ধ করে দেয় সীতেশ। বলে,—চল।

—কোথায়?—এতক্ষণে কথা বলতে পারে শোভনা।

—চলো। আমার সঙ্গে। কোথায় নাই বা বললাম।

—চলো।—ধীরে ধীরে ওঠে শোভনা।

শাড়ী পালটাবার কথা চুল আঁচড়াবার কথা, বলতে পারে না সীতেশ। শোভনারও মন চায় না।

একটা চাদর জড়িয়ে নিয়ে সীতেশের সঙ্গে বেরোয় শোভনা।

সীতেশ ওকে নিয়ে যায় ওর দাদার ওখানে।

দিন দশেক কেটে যায়। শোভনা কিছুটা সহজ হয়ে আসছে। দাদার জন্যে মাঝে মাঝে নির্জন দুপুরে বা গভীর রাত্রে মনটা যে কেমন করে ওঠে— এ কথা সত্যিই। কিন্তু তবুও অনেকদিন দাদার সঙ্গে না থেকে দাদার ওপর মায়াটা কমে এসেছিলো। তাই একেবারে ভেঙে পড়ে না। বৌদি তার ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে। ওদিকটা শুধু একেবারে ফাঁকা মনে হয় মাঝে মাঝে। একটা দিক নেই তার। একটা দিক আছে।

এখন সীতেশই তার সবচেয়ে আপনার। আরও গভীর হয়ে আসে ওদের সম্পর্ক। আরও নরম হয়ে পুরো নারীর রূপ নেয় শোভনা।

সীতেশও বুঝতে পারে সবকিছু। তবু একএকবার ওরও দাদার কথা যখন মনে পড়ে তখন শোভনার সঙ্গ অসহ্য হয়ে ওঠে, যেন এক অপরাধের কালি ও কিছুতেই মুছে ফেলতে পারে না মন থেকে। আর কালি সবটাই দেখতে পায় শোভনার মুখে।

বীরেশের ওপর শোভনার সেদিনের অকারণ বিদ্বেষ সীতেশ ভুলতে পারে না কিছুতেই। বীরেশের অপমান ওর মনে যে তুষানল জ্বালিয়ে রেখেছে তা নেভে না, মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠে। জ্বালা দেয়।

সীতেশ অকারণেই তখন নানাভাবে শোভনার ওপর বিরূপ হয়ে ওঠে। এ দশদিন যেন কিছু কম।

ঠিক এগারোদিনের মাথায় সকালবেলা মাধুরী তখন রান্নাঘরে, সীতেশ ধীরেশ তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি, শোভনা ভোরে উঠে কলতলায় যাবে, এমনি সময় কড়ানাড়ার শব্দে দোরের কাছে যায়।

—কে ?

আবার কড়া নাড়ার শব্দ।

—কে ? — শুধোয় শোভনা।

কড়া নাড়তেই থাকে।

শোভনা দোরটা খোলে। গয়লা এলো নাকি আজ এত ভোরে !

—কে ?

লোকটি দাঁড়িয়ে আছে একটা স্যুটকেস হাতে নিয়ে।

শোভনার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে বলে ওঠে,—আপনি ?

শোভনাও বিস্মিত কম হয়নি ; তবু বিস্মিত হলে ওর চলবে না। ভ্রূদুটো কুঁচকে বলে,—আপনাকে তো আমি চিনি না। কে আপনি ?

—আমি সুধাকর।—ধীরে ধীরে বলে লোকটি।—আপনাদের কলেজ হোস্টেলের মিস্টার সোমের বন্ধু।

শোভনা কথাটা ঘুরোয়,—মিস্টার সোমের অনেক বন্ধু ছিল। আসুন। আপনিই তো আমার জা মাধুরীর দাদা, আপনার আসবার কথা ছিল দশদিন আগে।

—আসতে পারি নি। কারণ কিছু নেই। এমনিই। তা হোক। আপনি এখানে কি করে?

শোভনা বলে,—আমি মেজদির ছোট জা। আসুন ভেতরে আসুন।

সুধাকর ভেতরে ঢোকে এবার।

শোভনার পাশে এসে বলে একবার,—আগের পরিচয়টা অস্বীকার করে চলব?

শোভনা যেন ও-কথা শুনতেই পায় নি এমনভাবে বলে,—কই আসুন। অ মেজদি!

বলে রান্না ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

মাধুরী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে,—ওমা সুধা দা! কখন এলে?

উত্তরটা শোভনাই দেয়,—এই মাত্র।

মাধুরী বলে,—এসো। ওপরে এসো।

বলে ওকে নিয়ে ওপরে উঠতে থাকে।

শোভনা যায় না। রান্নাঘরেই থাকে।

ওপরে উঠতে উঠতে শুধোয় সুধাকর,—সীতেশ কই?

—ঠাকুর পো ঘরে। বোধহয় ঘুম থেকেই ওঠেনি।

—কোন ঘর?

মাধুরী ওকে সীতেশের ঘরেই নিয়ে যায়। সুধাকর গিয়ে ঠেলা মারে সীতেশকে,—ওঠ্। কত বেলা অব্দি ঘুমোস্‌রে?

সীতেশ ধড়মড় করে উঠে পড়ে। চোখ কচ্‌লে সুধাকরকে দেখে অবাক হয়, খুশীও হয়। শুধোয়,—কখন এলে? জিনিসগুলো রাখো ওপাশে।

সুধাকর স্যুটকেস বিছানা রেখে সীতেশের বিছানায় বসে পড়ে।

সীতেশ একটু বাইরে যায়। হাত মুখ ধুয়ে আবার আসে।

বলে,—আসবো আসবো করে এতদিনে সময় হোল?

সুধাকর অকারণে হাসে খুব জোরে,—সময় কি হয় রে। জোর করে করে নিতে হয়। কিন্তু তোর ঘরে শাড়ী কেন রে?

সীতেশ একটু লজ্জা পায় সুধাকরের কাছে,—বিয়ে করেছি যে!

—কবে?—সুধাকর আকাশ থেকে পড়ে।

সীতেশ বলে,—কিছুদিন। তোমাকে অবশ্য জানানো হয়নি।

—না জানিয়ে খুব ভাল করেছিস।

—কেন?

—জানালেই তো কিছু টাকা খরচা হোত!—আবার হাসে সুধাকর।

ওর প্রাণখোলা হাসিতে আর কথায় সীতেশও যেন অনেকটা হালকা হয়ে আসে।

বলে,—খরচা তো তুমি বড়ই কম করো। কৃপণ হলে কবে থেকে?

—তা কৃপণ বই কি? জানিস আমার বোম্বের এক বন্ধু—এক স্টেটের রাজকুমারীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো। রাজকুমারী তাকে না বিয়ে করে অন্য একজনকে বিয়ে করল আর জব্দ করবার জন্যে নেমন্তন্ন করল। সে কি দিয়েছিল জানিস বিয়েতে?

—কি?

—হীরের নেকলেস এক ছড়া। সাড়ে এগারো হাজার টাকা দাম। দিয়ে নেমন্তন্ন বাড়িতে না খেয়ে চলে এলো।

—না খেয়ে চলে এলো?

—হ্যাঁ রে! রাজকুমারী খবর শুনে নেকলেসটা ভেঙে টুকরো টুকরো করে তার বাড়িতে ফেরত পাঠালো। এরাই খরচে।

—তা বটে।—সীতেশ জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাঁকে,—কইগো, চা নিয়ে এসো।

শোভনাকে উদ্দেশ করেই হাঁকটা দেয়।

সুধাকর পকেট থেকে মোটা পার্সটা বার করে,—এই টাকাটা তোর কাছে রাখ।

সীতেশ হাতে নিয়ে বলে,—গুণে দিলে না, কত আছে?

—সাত হাজার কয়েক শ' হবে। রেখে দে' না।

সীতেশ একটু কিন্তু কিন্তু করেও টাকাটা হাতে করে রাখে।

শোভনা চা নিয়ে ঘরে ঢোকে।

সীতেশ বলে,—পরিচয় করিয়ে দিই। এই আমার বন্ধু—যার কথা তোমায় বলেছিলাম, সুধাকর। আর এই শোভনা।

সুধাকর নমস্কার করে হাত তুলে। শোভনাও। যেন এই তাদের প্রথম দেখা।

শোভনা একটু লজ্জা পায়।

সুধাকর কিন্তু হাসে জোরে। বলে,—জানেন, ও যখন ইস্কুলে পড়ে, তখন একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলো আমার কাছে?

শোভনা ভ্রূ কুঁচকে মুখে হাসি টেনে এনে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

সীতেশও তাকায়।

সুধাকর আর এক চোট হেসে নিয়ে বলে,—রাগ করবেন না যেন। বলেছিলো বড় হয়ে বিয়ে করে আমরা বউ বদল করে নেব।

সীতেশের মুখটা রাঙা হয়ে ওঠে,—বলে,—সব বাজে কথা। সুধাকর বরাবর এমনিই কথা বলে। ওর কথা একটাও বিশ্বাস কোর না।

শোভনা হাসতে হাসতে বলে,—তাছাড়া এখন তো একতরফা। ওঁর বিয়ে হলে তখন ভেবে দেখা যাবে। হয়তো বা তুমিই জিতে যাবে।

সীতেশ হাসতে থাকে খুব।

সুধাকর চায়ে চুমুক দেয়।

সীতেশ চা-টা খেয়ে ওঠে, কলঘরে যাবে।

যাবার সময় সুধাকরের টাকার ব্যাগটা শোভনার হাতে দিয়ে বলে,—বাক্সে রাখো। সুধাকরের টাকা আছে ওতে।

শোভনা বলে,—আমি পারব না। তুমি রাখো।

বলেই বেরিয়ে যায়।

শোভনার এমন বিসদৃশ ব্যাপারে বিস্মিত বিমূঢ় হয়ে পড়ে।

সুধাকর হাসতে হাসতে বলে,—তোর বউ দেখছি আমার ওপর চটেছে।

সীতেশ কথা না বলে নিজের স্যুটকেসে টাকাটা রেখে যায়।

মাধুরী এসে ঘরে ঢোকে।—শুধোয়,—সকালে কি খাও?

—দুটো ডিম সেদ্ধ কর্ আর একটা পাউরুটি দিস্।

—দুপুরে?

সুধাকর সিগারেট ধরায়,—তুই জ্বালালি মাধুরী। দুপুরে তোরা যা খাবি তাই।

—রাত্রে?

—কাঁচকলা ভাতে।

মাধুরী বলে,—সত্যি।

সুধাকর হাসে,—তুই এখনও গাধাই আছিস। রাত্রে লুচি-টুচি কিছু করে দিস।

মাধুরীও বলে,—অত খাবারের ফর্দ পারবো না বাপু। তুমি তোমার ভগ্নীপতির হোটেলে যাও বরং।

—ভাল কথা মনে করিচিস। ধীরেশবাবুর হোটেলে কি কাটলেট্ চপ হয়?

—হতে পারে।

—তবে সন্ধ্যের মুখে দু' চারখানা আনিয়ে দিবি। বুঝলি?

—সে দেখা যাবে। তোমার ডিম সেদ্ধ আগে করি।

বলে চলে যায় মাধুরী।

সুধাকর ওঠে। জানালার ধারে গিয়ে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

বুক পকেট থেকে খুচরো টাকার ব্যাগটা বার করে টাকা গোনে। ঘর থেকে বেরোয়।

নীচে আসতেই শোভনা শুধোয়,—কোথা যাচ্ছেন?

—আসচি।—বলে চলে যায় সুধাকর।

বাড়িটা যেন অনেক দিন পর জমকালো হয়ে ওঠে। সকলেই ব্যস্ত। সীতেশ কলঘর থেকে বেরিয়ে বলে, আজ আর ইস্কুলে যাব না।

ধীরেশ শুনে বলে, আজ একটু বেলায় বেরুব।

শোভনা মাধুরী সবাই ব্যস্ত।

কিছুক্ষণ পরই সুধাকর এক মুটের মাথায় বিরাট একটা রুইমাছ আর তরকারী এক ঝাঁকা নিয়ে ফেরে।

মাধুরী দেখে গালে হাত,—ওমা! দেখো সুধাদার কাণ্ড!

ধীরেশ নেমে আসে,—অনুযোগ করে,—আপনি তো বেশ চালাক লোক। কখন বাজার গেলেন।

সুধাকর হেসে বলে ধীরেশকে,—আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি এই প্রথম ব্যক্তি যিনি আমায় চালাক বললেন। আর সবাই তো বোকা বলে। কী রে সীতেশ?

সীতেশ হাসে,—কি কাণ্ড করেছ বলোত। এত মাছ কে খাবে?

শোভনার একবার মুখে আসে,—দাদার ওখানে কিছু পাঠালে হোত।

কিন্তু চেপে যায়।

আজ ক' মাস হয়ে গেল সীতেশ একবার দেখা করতেও যায় নি। ধীরেশ তো বলে তার সময়ই নেই। শোভনার অনেক সময় যেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু বলতে লজ্জা করে। নিজেকে যেন কেমন অপরাধী মনে হয়।

মাধুরী বলে, মাছটা কুটবে কে? তুই কুটবি?

শোভনা ফিস্ ফিস্ করে বলে,—আমি অত বড় মাছ কুটতে গিয়ে নষ্ট করে ফেলব।

সুধাকর ওপরে যায়। এবারে স্নান করে জলখাবার খাবে।

ওপরে উঠতে উঠতে সীতেশকে একবার শুধোয়,—হ্যাঁরে, তোর দাদাকে দেখছি না তো? মানে বড়দা।

সীতেশের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

সুধাকর তাকায়,—কি হয়েছে রে! তোর মুখ অমন হয়ে গেল কেন? মরে গেছে?

—না।—বলে সীতেশ।

—তবে।

সীতেশ বলে খুব আস্তে,—অন্য জায়গায় চলে গেছে।

সুধাকর চালাক লোক। কারণটা আর শুধোয় না। শুধু ঘাড় নেড়ে বলে,—অ! ভদ্রলোক বড় ভালো। মাধুরীর বিয়ের সময় দেখেছিলাম। তুইও তো পাঁচমুখে বলতিস দাদার কথা।

সীতেশ তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে যায়। আর একটা কথারও জবাব দেয় না।

সুধাকর চুপ করে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কি একটু ভেবে ওপরে উঠে যায়।

বীরেশের থাকবার ছোট ঘরখানায় সুধাকর আছে। সন্ধ্যার পর দোরটা খিল দিয়ে দেয় রোজ।

সীতেশ এসে দোর ধাক্কায়,—সুধাকর আছো?

সুধাকর দোরটা খোলে অনেক পরে,—আয়। কে সীতেশ!

সীতেশ ঘরে ঢুকে সুধাকরের মুখে কি একটা গন্ধ পায়।

ওর দিকে তাকিয়ে দেখে চোখদুটো রাঙা।

বলে—তুমি মদ খাও?

সুধাকর হাসে,—বরাবরই তো তুই জানিস ভাই। রাগ করিসনে।

সীতেশ কিছু বলে না। সত্যিই সীতেশ জানতো মদ সে খায়। তবে এভাবে বাড়িতে বসে মদ খাওয়া। কেমন যেন লাগে সীতেশের।

সুধাকর ওকে টেনে নিয়ে বসিয়ে বলে,—ভয় নেই। মদ খাই, কিন্তু মাতাল নই আমি।

—হতে কতক্ষণ?

—হবো না। তোকে কথা দিচ্ছি।—একটা সিগারেট ধরায় সুধাকর,—কোথায় গিয়েছিলি?

—ছেলে পড়াতে।—বলে সীতেশ। হঠাৎ সীতেশ প্রশ্ন করে,—আচ্ছা একটা কথা শুধোব?

—বল?

—তুমি এত টাকা পাও কোথায়?

সীতেশ বহুদিন জিজ্ঞেস করেছে। সুধাকর বলেনি। আজ মদের ঝোঁকে যদি বলে দেয়।

সুধাকর সিগারেট ধরায়। ওকে একটা সিগারেট দেয়।

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে,—ব্যবসা করি।

—কিসের?

—ধর্ম্মের।

—মানে?

—অনাথ আশ্রমের। মেয়েদের অবিশ্যি। থাকগে ওসব কথা।

সুধাকর চেপে যায়।

সীতেশ হতবাক হয়েই বসে থাকে।

সুধাকর আরও খানিকটা নেশা করে। তারপর বোতলটা সাবধানে রেখে দেয় স্যুটকেসের ভেতর।

মাধুরী ঘরে ঢোকে। একটা থালা নামিয়ে বলে সুধাকরকে,—এই নাও তোমার কাটলেট। তোমার ভগ্নিপতি পাঠিয়েছে।

সুধাকর কাটলেট ভেঙে খেতে থাকে। সীতেশকে বলে,—খা।

সীতেশ বলে,—না, আমি খাব না।

—কেনরে?

—শরীরটে ভাল নেই।—বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

দিনকতক ধরে খোকা জ্বরে ভুগছে। বীরেশ প্রথমটা অত যত্ন কিছু নেয়নি। ভেবেছে জ্বর হয়েছে ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু জ্বরটা ছাড়ে না। দিন পাঁচেকও যখন জ্বর ছাড়ে না তখন সুবর্ণ বলে,—একটা ডাক্তার দেখাও। জ্বর তো ছাড়ছে না।

বীরেশ চুপ করে ভাবে।

সুবর্ণ আবার বলে,—কি ভাবছ? ডাক্তার না দেখিয়ে কি ছেলেটাকে মারবে? দিন দিন যে দুর্বল হয়ে পড়ছে।

কথাটা ঠিকই। বীরেশও বোঝে। কিন্তু বুঝেই বা কি করতে পারে।

তবু ডাক্তার ডাকতে হয়। দেখাতে হয়।

ডাক্তার বলে যায়, টাইফয়েডের মতো মনে হচ্ছে। সাবধানে রাখতে হবে।

বীরেশ মাথায় হাত দিয়ে বসে। সুবর্ণ খোকার মাথার কাছে বসে থাকে পাখা নিয়ে।

দিন দুয়েক পরে জ্বর বাড়ে।

আবার ডাক্তার আসে। মাথায় বরফ দিতে বলে।

ওষুধে ডাক্তারে যে কটা টাকা ছিল ফুরিয়ে যায়।

সুবর্ণ কেঁদে ফেলে,—আর টাকা যে নেই। কি হবে?

বীরেশ তেমনি চুপ করেই বসে ভাবে।

—আপিস থেকে ধার করতে পারবে না?—শুধোয় সুবর্ণ শেষ আশা নিয়ে।

বীরেশ বলে,—না। আপিসের আগের ধারই শোধ হয়নি।

—আগের কোন ধার?

—সীতেশের বিয়ের সময় যে ধার করেছিলাম।

একটু ভেবে সুবর্ণ বলে,—আচ্ছা ঠাকুরপোর কাছে একবার যাও না। টাকা চেয়ে দেখো না যদি দিতে পারে কিছু।

বীরেশ কিছুক্ষণ ভেবে বলে,—ওরা কোথা থেকে দেবে?

—তুমি একবার যাও না?

বীরেশ বলে,—গিয়ে দেখে লাভ হবে না সুবর্ণ।

—তবু একবার গিয়ে দেখতে ক্ষেতি কি?

বীরেশ চুপ করে ভাবে অনেকক্ষণ। আর কোন কথা বলে না। কালই আবার ডাক্তার আসবে। কালই টাকা চাই।

সমস্ত রাত ভাল ঘুম হয় না বীরেশের।

সকালে উঠে হাতমুখ ধুয়ে খোকার পাশে আসে। শুধোয় সুবর্ণকে,—জ্বর কতটা?

—আড়াই। সমস্ত রাত ছটফট করেছে।

রাত জেগে সুবর্ণর চোখমুখ বসে গেছে।

বীরেশ বলে,—আমি বরং বসি। তুমি কাজ সেরে এসো।

সুবর্ণ বলে,—তোমাকে বসতে হবে না। তুমি একবার ঠাকুরপোদের কাছে যাও।

বীরেশের মুখটা শুকিয়ে যায়।

তবু আর উপায়ই বা কি ?

একবার গেলে হয়তো ভালও হতে পারে।

জামা গায়ে দিয়ে চটিটা পরে বীরেশ আস্তে আস্তে পথ চলে। পা চলতে আর চায় না। তবু যেতে হবে। গিয়ে সীতেশের কাছে চাইতে হবে। দিলে সীতেশই দিতে পারে। ধীরেশ দেবে না।

ওদের বাড়ির সামনে এসেও দু'বার ইতস্তত করে। ঢুকবে কি ঢুকবে না।

দোর ঠেলে দেখে দোর ভেতর থেকে বন্ধ। এখনও হয়ত ওরা ওঠেনি। আস্তে দু'বার কড়া নাড়ে। দোরটা খুলে যায়।

সামনেই শোভনা।

বীরেশকে দেখে শোভনার মুখটা সাদা হয়ে যায়। বীরেশকে এত ভোরে এমন ভাবে আসতে দেখে অবাক তো হয়ই, একটু অপ্রকৃতিস্থও হয়ে পড়ে।

হঠাৎ দরজার কাছ থেকে সরে রান্নাঘরের ভেতর ঢুকে যায়। একটা কথা বলতেও পারে না।

বীরেশ দোরের সামনে দাঁড়িয়ে শোভনাকে পালাতে দেখে একটু অবাক হয়।

ভেতরে ঢোকে।

কলতলা থেকে মাধুরী বেরোয়,—ওমা, দাদা কখন এলেন ?

বীরেশ একটু হাসে,—এই মাত্তর বৌমা। ধীরেশ কই ? সীতেশ ?

—ওরা ওঘরে। ঘুমুচ্ছে। আসুন।

মাধুরী আগে আগে উঠে সীতেশের ঘরের সামনে এসে দেখে সীতেশ উঠেছে। সুধাকরের সঙ্গে গল্প করছে।

—অ ঠাকুরপো। দাদা এসেছে।

দাদা ! সীতেশের মাথাটা ঘুরে যায়। ও কি করবে ঠিক করতে না পেরে চট করে উঠেই ঘরের খিলটা বন্ধ করে দেয়।

সুধাকর অবাক হয়ে যায়,—এ কি করলি রে ?

সীতেশ একটু থেমে বলে,—না। মানে সকাল বেলা আবার ঝামেলা !

—ঝামেলা কি রে ? তোর দাদা এসেছে যে !

—আসুক গে ! দাও একটা সিগারেট টিগারেট দাও।

সুধাকর নীরবে ওর দিকে সিগারেটের টিনটা এগিয়ে দেয়।

বীরেশ সীতেশের দোরের সামনে দাঁড়ায়।

ঘরে খিল দিতে দেখে মাধুরীও অবাক হয়ে যায়।

বীরেশ খিলের শব্দটা শুনেছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মাধুরীকে বলে,—সীতেশকে একবার ডাকো না। একটু কাজ ছিল।

মাধুরী শুধু বলে,—ডাকলুম তো ? কিছু তো বললে না !

বীরেশ চুপ করে দাঁড়িয়ে একটু ভাবে। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বলে,—আচ্ছা, আমি যাই বৌমা।

মাধুরী বলে,—একটু চা খেয়ে যাবেন না দাদা ?

—থাক। আমার কাজ আছে।

—সবাই ভাল আছে ?—শুধোয় মাধুরী।

বীরেশ একটু স্তব্ধ হয়ে থেকে বলে,—হ্যাঁ ভালই। খোকার একটু জ্বরের মতো—এই আর কি ! বলতে বলতে নীচে নামতে থাকে।

আশ্চর্য এই যে বীরেশের পা একটুও কাঁপে না।

স্থির প্রশান্তি ওর নষ্ট হয় না কিছুতেই।

নীচে এসে রান্নাঘরের সামনে আসতে শোভনা সামনে এসে বীরেশের পায়ে প্রণাম করে।

বীরেশ একটু হেসে বলে,—ভালো আছো মা ?

শোভনা মুখ নীচু করে ঘাড় নাড়ে। একটা কথাও বলতে পারে না।

বীরেশ বেরিয়ে যায়।

শোভনা তবু দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকক্ষণ যতক্ষণ না মাধুরী এসে ওকে ডাকে।

বীরেশ বাড়ি আসতেই স্বুবর্ণ শুধোয়—কই, ঠাকুরপো কি বললে ?

বীরেশ ও কথার উত্তর না দিয়ে বলে,—অপিস বেরুতে হবে। ভাত হয়েছে ?

স্বুবর্ণ ওঠে ছেলের কাছ থেকে।—হ্যাঁ। ভাতে ভাত হয়ে গেছে। ছোট ঠাকুরপোর কাছে টাকা পেলে ?

—না।

স্বুবর্ণর মুখটা শুকোয়,—কেন ? কি বললে ?

—কি আর বলবে।—বলতে বলতে গামছাটা নেয় বীরেশ।

—তবু কি বললে শুনি ? তুমি বলেছিলে খোকার অসুখ ?

বীরেশ শুধু বলে,—না।

বলে কলতলায় চলে যায়।

স্নান করে এসে ভাত খেতে বসে।

আবার শুধোয় স্বুবর্ণ।—অপমান করলে বুঝি ?

বীরেশ ভাত খেতে খেতে বলে,—না, ও সব কথা থাক। ডাক্তারবাবু এলে বোল বিকেলে টাকা দোব। ডাক্তারবাবুর ডিসপেন্সারীতে বিকেলে আমি যাব।

—এ বেলা তো ওষুধ আনা হোল না।—মুখ শুকোয় আবার স্বুবর্ণর।

বীরেশ গম্ভীর মুখে তাকিয়ে বলে,—একটা বেলা ওষুধ না খেলে মরবে না। ভয় নেই। যা বললাম তাই বোল।

সামান্য কটা ভাত খেয়ে ওঠে বীরেশ।

ও মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে। অপিসের সায়েবকেই বলতে হবে আবার।

আরও কিছু ধার অপিস থেকেই করতে হবে।

অপিসে গিয়ে প্রথমেই ও ছোট সাহেবের ঘরে যায়। ছোট সাহেব মানুষটি মুখে অত্যন্ত কর্কশ।

সব শুনে বলে,—কি করবো। আমার কিছু করবার নেই।

বীরেশ বলে ধীর ভাবেই,—আপনাকে কিছু একটা করতেই হবে। ছেলেটা মরে যাবে নইলে।

—মরে তো মরবে। যান, কাজ করুন গে।

বীরেশ সায়েবের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বসে ভাবতে থাকে। কি করা যায়!

সমস্ত দিনটা এক অস্বস্তিতে কাটে। তবু সায়েবকেই আবার বলতে হবে।

বিকেলের দিকে ছোট সায়েব ওকে ডেকে পাঠায়।

ও ধীরে ধীরে ঘরে ঢোকে।

ছোট সায়েব বলে,—কি হোল, আর কোথাও টাকার জোগাড় করতে পারলেন?

—না।—বলে বীরেশ।

ছোট সায়েব বক্ বক্ করতে থাকে,—আপনাদের জ্বালায় আমাকেই কোনদিন এ অপিস ছেড়ে যেতে হবে।

বলতে বলতে পকেট থেকে ব্যাগ বার করে সত্তর টাকা দেয় বীরেশের হাতে।

বলে,—আবার লাগলে বলবেন।

বীরেশ নীরবে টাকা নিয়ে নমস্কার জানিয়ে চলে আসে। ও জানত, ছোটসায়েব মুখে যতখানি কর্কশ, মনে ঠিক সেই পরিমাণেই নরম।

বীরেশ অপিস থেকে ফেরবার পথে ডাক্তারখানা হয়ে, বাজার হয়ে ফেরে।

মাধুরী শোভনা রেঁধে কুল পায় না। সুধাকর প্রতিদিন আটদশটাকার বাজার করে আনে। মাধুরী ভারী খুশী। মুখে একটু রাগারাগি করে। বীরেশ সীতেশও খুশীই হয়। চটে যায় শুধু শোভনা।

সেদিন ভ্রূ দুটো কুঁচকে সুধাকরের সামনেই বলে ফেলে শোভনা,—এ কি অন্যায় মেজদি, উনি রোজ রোজ এত বাজার আনবেন। আমাদের কি বাজার করে খাওয়াবার ক্ষমতাও নেই? উনি কি ভেবেছেন?

মাধুরী হেসে বলে,—নারে না, সুধাদা বোনদের খাওয়াতে আনে।

শোভনা বলে,—খাওয়াতে হয় তো ওঁর বাড়ি গেলে উনি খাওয়াবেন।

সুধাকর তখন আর কোন জবাব দেয় না।

মাধুরী হাসতে হাসতে চলে যায়।

দুপুরে শোভনা ঘরে শুয়ে শুয়ে একটি বই পড়ছিল। সীতেশ স্কুলে। মাধুরী ঘরে খিল দিয়ে শুয়েছে। ধীরেশ হোটেল থেকে এসে খেয়ে মাধুরীর কাছে শুয়েছে, দুপুরে ঘরে খিল দেয় ওরা। বরাবর।

হঠাৎ চৌকীতে কার বসবার শব্দ পেয়ে চমকে শোভনা উঠে বসে।

সুধাকর এসেছে।

—আপনি? শোভনা ভ্রূ দুটো আবার কোঁচকায়।

—হ্যাঁ, সকালের কথার জবাবটা দিতে এলাম।

—কোন্ কথার?

—ওই যে বললেন, কেন বাজার করি এত?

শোভনা এতক্ষণে একটু হাসে। তবু একা একা এ ভাবে ওর সঙ্গে বসে গল্প করতে একটু ইতস্তত করে।

সুধাকর নির্বিকার মুখে শোভনার দিকে তাকিয়ে বলে,—কেন বাজার করি শুনবেন?

শোভনা তাকায়।

—আমি খরচা করলেই আপনার রাগ হবে এ আমি জানতাম। হোস্টেলেও দেখতাম কিনা তাই।

শোভনা চুপ করেই থাকে।

স্তব্ধ দুপুরে কথাগুলো কাণে যেন মন্দ লাগে না। মনটা অনেকগুলো বছর পেরিয়ে সেই হোস্টেলের দিনগুলোর স্মৃতিতে ফিরে যায়।

তন্বী তেজী রূপসী তরুণী তখন শোভনা।

ওর তেজের সামনে তখন দাঁড়াতে পারে এমন ছেলে কই! এ ছেলেটিও এসেছিলো সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টের বন্ধু হিসাবে।

সুধাকর যথেষ্ট খরচা করত। অন্য মেয়েরা সুধাকরের চারপাশে গুণগুণ করত।

শোভনা বাদে।

সেদিন একটা পার্টি ছিল বাইরের এক বাগানে।

সুধাকর ইচ্ছে করেই বসেছিলো শোভনার পাশে। সুধাকরের সেদিনকার পোশাকটাও বেশ মনে আছে শোভনার। ঢলঢলে পায়জামা আর গরদের পাঞ্জাবী, চাদর। দেখতে ভালোই লেগেছিলো লোকটাকে।

পার্টির খরচের মোটা অংক বহন করেছিলো সুধাকর।

হঠাৎ বলেছিলো সুধাকর,—মিস্ সান্যাল, বলতে ভয় হয়, এবার বম্বে থেকে একটি জিনিস এনেছি। মিস্ রয় চাইছিলো, কিন্তু তাকে দিলুম না।

শোভনা বলেছিলো হেসে,—কেন? দিলেই তো পারতেন?

—সব জিনিস তো সবাইকে মানায় না।

শোভনা জবাব দিয়েছিলো এবার গম্ভীর হয়ে,—এত দেবার আগ্রহটা দেখতে শুনতে খুব ভাল নয়।

পোর্টফোলিও থেকে দামী একটি স্কার্ফ বার করে শোভনার হাতে দিয়ে বলেছিলো সুধাকর,—এটা আপনাকে দিলে নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন না?

শোভনার মুখটা রাঙা হয়ে উঠেছিলো লজ্জায় নয়, রাগে।

বলেছিলো,—কত দাম?

সুধাকর মধুর হেসে যেমন সব মেয়েকে বলে তেমনিই বলেছিলো,—অমূল্য। এর দাম নেই।

—অমূল্য জিনিস রাখবার জায়গা আমার নেই। ধন্যবাদ।

বলে সুধাকরের ঠিক নাকের ওপর স্কার্ফটা ছুড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিলো শোভনা।

হাসি পায় আজ শোভনার সুধাকরের তখনকার বোকা বোকা মুখটা মনে পড়ে।

সেই পার্টির শোভনা আজ আর নেই। শোভনার আজ কত পরিবর্তন।

সে স্কুল মাস্টারের নিরীহ গৃহিণী আজ।

শোভনা তাকায় সুধাকরের দিকে। সুধাকর আজও প্রায় তেমনিই আছে। একটুও বদলায় নি।

সুধাকর বলে,—তখন থেকেই আপনার রাগটা আমার ভাল লাগে।

শোভনা রিক্ত হেসে বলে—আপনার বোকামীটা আমার আরও ভাল লাগে।

সুধাকর রাগে না। হেসেই বলে—তবে নিতান্ত বোকা হতেও রাজী আছি।

শোভনা হেসে ফেলে—ওঃ! কত বছর কেটে গেল। এখনও আপনি তেমনিই আছেন?

সুধাকর বলে,—আর আপনি!

—আমি আর তেমন কই আছি।

—কেন?

—চোখ খুলে রাখলেই তো দেখতে পেতেন কত পরিবর্তন!

—পরিবর্তন চোখে পড়েছে ঠিকই।

—চোখে পড়বার মতো তো বটেই। দৃষ্টিকটু লাগবার মতো।

—না।—সুধাকর একটু থেমে বলে,—আপনার পরিবর্তনটা আরও মধুর।

শোভনা হেসে ফেলে। অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে ও। বলে,—আপনি আবার কাব্য সুরু করলেন দেখছি। ছেলেমানুষী কি এখনও গেলো না?

কথায় কথায় বেলা গড়িয়ে আসে।

বিকেল হয়ে আসে।

শোভনার আলাপ করতে বেশ ভালই লাগে। সুধাকরেরও।

হঠাৎ শোভনা বলে,—আপনার বন্ধুর আসবার সময় হোল। ওর খাবার করতে হবে।

শোভনা ওঠে বলতে বলতে,—আপনার তো আবার এ খাবার চলবে না। হোটেলের চপ কাট্‌লেট্ চাই।

সুধাকর হাসে,—না, আপনার হাতের খাবার পেলে চপ্ কাট্‌লেট্ খাব না আর।

শোভনা যেতে যেতে বলে,—পাঠিয়ে দিচ্ছি। বসুন।

নীচের ঘরে এসে শোভনা অবাক। সীতেশ বসে খবরের কাগজ পড়ছে।

—কখন এলে ?

সীতেশ মুখ না তুলেই বলে,—কিছুক্ষণ আগে।

—ঘরে যাওনি কেন ? জামা কাপড় ছাড়ো গিয়ে।

সীতেশ গম্ভীর মুখে বলে,—এমনি।

সীতেশ সুধাকরকে আর শোভনাকে গল্প করতে দেখেও কথাটা প্রকাশ করে না।

শোভনা স্টোভটা জ্বালাতে বসে বলে,—এখুনি খাবার করে দিচ্ছি। বোস। একটু বেশী করে করতে হবে।

—কেন ?

—তোমার বন্ধুও আজ খাবার খাবেন।

—অ।—সীতেশ আর কিছু বলে না। ওপরে উঠে যায়।

এরপর প্রায় রোজ দুপুরে সুধাকর শোভনার ঘরে আসে। কথায় কথায় বেশ গল্প জমে। আগেরদিনের কথা বলে কিছুটা যেন আরাম পায় শোভনা।

সুধাকর এমনিতেই গল্প জমাতে ভারি পটু। কথায় কথায় অনেক কথা বেড়ে যায়।

কোন কোন দিন সীতেশ এসে পড়ে। বলে, তোমাদের কি ডিস্‌টার্ব করলাম ?

শোভনা একটু লজ্জা পায় যেন।

সুধাকর হেসে বলে,—মোটেই না। তুই আমাদের সঙ্গে জয়েন্ করতে পারিস।

শোভনা উঠে খাবার করতে যায়।

সুধাকরও খাবার খায়। বলে,—তোর স্ত্রীভাগ্য বড় ভালরে !

সীতেশ তাকায়,—কেন ?

—এমন রান্না করতে পারে ! কি বলিস তুই !

সীতেশ বলে,—রান্না তো রাঁধুনিও করতে পারে।

সুধাকর হো হো করে হেসে বলে,—তুই একটা গাধা। এমন মিষ্টি হাতের ছোঁয়া রাঁধুনীর রান্নায় পাবি কি করে?

হঠাৎ সুধাকরের মাথায় একটা খারাপ বুদ্ধি খেলে। শোভনা আসছে কিনা উঁকি মেরে দেখে নিয়ে বলে,—একটা কথা বলা হয় নি।

—কি?

—তোর গৃহিণীটি আমার পুরোনো বন্ধু।

সীতেশের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। বলে,—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। বলিস নি যেন ওকে। লজ্জা পাবে।

সীতেশ নিজেকে সামলে নেয়। একটু বাঁকা হেসে বলে,—আবার লজ্জাও পাবে!

সুধাকর খাবারের থালাটা রেখে সীতেশকে বলে,—এক গেলাস জল গড়িয়ে দে না ভাই।

—জল আসছে।

সুধাকর দেখে শোভনা দু'গ্লাস জল নিয়ে ঘরে ঢুকছে।

শোভনা জল দিয়ে চলে যায়।

সীতেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে,—একটু বেরুব। কাজ আছে।

বলে জামাটা পরে বেরিয়ে যায়।

সুধাকর একটু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে চলে যায়।

সেদিন রাত্রে শোভনা শুয়ে পড়বার পর সীতেশ ওঠে। এক গেলাস জল খেয়ে একটা সিগারেট ধরায়।

শোভনার কাছে আসে। শোভনা তাকায়।

সীতেশ ওর পাশে বসে, গম্ভীর স্বরে বলে,—সুধাকরের সঙ্গে কি তোমার আগে পরিচয় ছিল?

শোভনা চমকে যায়। এমন একটা প্রশ্ন ও আশা করতে পারে নি।

একটু ভেবে স্বরটা স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টা করে বলে,—কেন বলোতো?

—না, শুনলাম কি না তাই।—সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে সীতেশ।

শোভনা চুপ করে থাকে।

সীতেশও চুপ করে থাকে।

কিছুক্ষণ সময় কাটে।

শোভনা বলে,—উনিই বলেছেন বুঝি?

—বললেও কি কিছু অন্যায় করেছে বলে মনে করো?

শোভনা বলে,—অন্যায় নিশ্চয়ই। কেন না পরিচয়টা এতই অল্প ছিল যে, সেটা বলবার মতো কিছু নয়।

সীতেশ বাঁকা হেসে বলে,—ও হয়তো বলবার মতো কিছু মনে করেছে বলেই বলেছে।

—তবে ভুলই করেছে!—শোভনা দৃঢ় কণ্ঠে বলে,—আমাদের হোস্টেলে মাত্র দু' চার দিনের আলাপ। তাও উনি আমার কাছ থেকে অপমানিত হয়েছিলেন।

—কেন? ওর অপরাধ?

—অপরাধ? মেয়ে দেখলেই তার সম্বন্ধে ওঁর অন্যায় কৌতূহল।

সীতেশ সিগারেটটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে,—তোমার সম্বন্ধেও তাহলে কৌতূহল ছিল?

—ছিল।

—সেটা অন্যায় না হতেও পারে। তুমি তো দেখতে খারাপ ছিলে না।

শোভনা গর্জন করে,—কি যা তা বলছ তুমি! তোমার ইংগিতগুলো অত্যন্ত কুশ্রী।

—তা হবে। আলাপ তোমাদের আর দোষ সবই আমার।

—তা নয়। উনি সে অপমানটা আজও ভুলতে পারেননি বলেই তোমাকে এ সব কথা বলেছেন।

—তুমিও কি ভুলতে পেরেছ?

—আমার ভোলা না-ভোলার প্রশ্নই ওঠে না। ওর সম্বন্ধে কোনদিনই কিছু ভাবিনি আমি। বললে রাগ কোর না, ওর চেয়ে অনেক ভাল, অনেক

ধনীর ছেলে আমার কৃপা ভিক্ষে করে ঘুরে বেড়াত।

সীতেশ হেসে ওঠে,—বলো কি। তাদের মনে ব্যথা দিয়ে এই গরীব মাস্টারকে কেন কৃপা করলে!

শোভনা বিরক্ত হয়ে বলে,—তুমি কি রাত দুপুরে ঝগড়া করতে চাও?

সীতেশ আর একটা সিগারেট ধরায়,—না ঝগড়া করতে চাইনে। একটা সত্যি খবর যাচাই করে নিচ্ছিলাম।

—যাচাই করা শেষ হয়েছে?

সীতেশ সিগারেট টানে।

শোভনা বলে,—তবে ঘুমোও।—বলে নিজেই পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে।

সীতেশ অনেকক্ষণ বসে বসে সিগারেট টানে। তারপর শুয়ে পড়ে।

সুধাকরের ব্যবহারটা ক্রমশঃই বিরক্তিকর হয়ে ওঠে শোভনার কাছে। শোভনা আজকাল দুপুরে এসে ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে পড়ে।

সুধাকর এসে দোর ধাক্কা দেয়।

প্রথমটা খুলতে চায় না শোভনা। কিন্তু জোরে ধাক্কা দিতে থাকায় বাধ্য হয়ে খুলতে হয় দোর।

সুধাকর প্রথমেই বলে,—মাপ করবেন। কিছু অন্যায় করলাম কি?

শোভনা কি আর বলে! বিশেষ করে মাধুরীর ভাই, স্বামীর বন্ধু। কাজেই জোর করে হেসে বলতে হয়,—না, মানে খুব ঘুম পাচ্ছে।

সুধাকর হাসতে হাসতে বলে,—আর তো দু'তিনটে দিন আছি। এ কটা দিন না হয় নাই ঘুমোলেন। কি জানেন, একা একা দুপুরে ভাল লাগে না।

—বই পড়লেই তো পারেন?

—ওরে বাব্বা! —চোখ কপালে তুলে বলে সুধাকর,—চার পাতা পড়বার পর হাঁসফাঁশ করে বুকটা। অত ধৈর্য ধরতে পারিনে।

শোভনা একটু খোঁচা দেয়,—গল্প করবার বেলায় তো খুব ধৈর্য!

তারপর সুরু হয় এ কথা সে কথা। কথায় কথা বাড়ে। শোভনা একটু পরেই জমে যায় গল্পে। লোকটা গল্প বড় ভাল বলে!

সমস্ত দুপুরটা কেটে যায়।

তারপর দিন শোভনা ঘুমের ভাণ করে দোর বন্ধ করে থাকে। সুধাকর ঘরে ঢুকতে পায় না। ফিরে যায় ক্ষুণ্ণ হয়ে শুধু নয়, রেগে।

যাবার আগের দিন সন্ধ্যে বেলা শোভনা ঘরে বসেছিলো। সেদিন দুপুরে সুধাকর আর আসে নি। শোভনা বসে বসে ভাবে আজ তো সুধাকর দুপুরে এলো না! ব্যাপারটা কি?

সীতেশ ছেলে পড়াতে বেরিয়েছে আজ।

শোভনা সুধাকরের ঘরের দিকটায় একবার যায়। সুধাকর চুপ করে বসে সিগারেট টানছে। শোভনাকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসে.—শুনুন।

শোভনা যেন চোরের মতো ধরা পড়ে গিয়ে কি করবে কিছু ঠিক করতে না পেরে ঘরে ঢোকে।

সুধাকরের দিকে তাকিয়ে ওর বুকটা কেঁপে ওঠে। ওর চোখদুটো রাঙা টুকটুকে। ঘরে মদের গন্ধটাও বেশ টের পায় শোভনা।

সুধাকর আজ আর হাসে না। বলে,—কেন দাঁড়িয়েছিলে এখানে?

'তুমি' সম্বোধন শুনে শোভনা আরও ভয় পায়। মুখে হাসি এনে বলে,—এমনিই। নীচে যাচ্ছিলুম, ভাবলুম দেখে যাই কি করছেন। আজ দুপুরে তো এলেন না?

সুধাকর এগিয়ে আসে। —যাই নি। ইচ্ছে করে যাই নি। গেলে তো তাড়িয়ে দিতে।

শোভনা দোরের দিকে পিছিয়ে আসে।

সুধাকরের চোখ দুটো জ্বলে। টুক করে এসে দোরটা বন্ধ করে দেয়।

বলে, গম্ভীর স্বরে,—দেখো কলংক আমার গা সওয়া। কিন্তু চেঁচিয়ে তোমার কলংক ডেকে এনো না।

শোভনার পা দুটো ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে থাকে।

অত তেজী মেয়ে এমন একটা অবস্থায় পড়ে আতংকে নীল হয়ে যায়।

সুধাকর বলে,—কয়েকটা কথার জবাব দেবে ?

শোভনা বলে,—বলুন।

—তোমার কি একটু দয়াও নেই ?

—দয়া হোত যদি আপনি ভদ্র ব্যবহার করতেন।—বলতে বলতে যেন জ্বলে ওঠে শোভনা। —কি ইচ্ছে হচ্ছে জানেন ?

—কি ?

—আমার পায়ের জুতোর দাগ আপনার গালে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

সুধাকর মুখ নীচু করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বলে,—আমি অভদ্র নই শোভনা। তুমি যাও।

দোরটা খুলে দেয় সুধাকর। বলে,—আমিও কাল ভোরে চলে যাব।

শোভনা দোর দিয়ে বেরিয়েই দেখে সামনে সীতেশ।

ভূত দেখে ভয় পায় যেন শোভনা। পা দুটো আঠার মতো আটকে যায়।

সীতেশ শুধু বলে, —অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম।

বলে নিজের ঘরে চলে যায়।

শোভনা সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। ঘরে যাবার আর সাহস হয় না। নীচে রান্নাঘরে মাধুরীর কাছে চলে যায়।

ওর চোখমুখ বসে গেছে। কি একটা আতংকে শোভনা বারেবারেই চারদিকে তাকায়।

মাধুরী বলে,—কি হয়েছেরে ? অমন ছটফট করছিস কেন ?

শোভনা হাসবার চেষ্টা করে বলে,—না, কিছু নয়।

একটু পরে আবার বলে,—আমি একটু রাঁধি মেজদি, তুমি না হয় ওপর থেকে তেল নিয়ে এসো।

মাধুরী কড়াটা ধুতে ধুতে বলে,—থাক্। তোর আর রেঁধে কাজ নেই। বরং পিঁড়ে ক'খানা পেতে রাখ। পরিবেশন করিস।

শোভনা খাবার ঘরে পিঁড়ি পাতে, জল দেয়। কিন্তু গ্লাসগুলো তো ধোয়া হোল না।

বড় ভুল হচ্ছে আজ। কিছুতেই মনটাকে স্থির করতে পারছে না শোভনা।

আবার গ্লাস ধুয়ে জল ভরে।

মাধুরীর রান্না হয়ে আসে। রাত বাড়ে।

ওদের সবাইকে খেতে ডাকে মাধুরী।

সুধাকর জানায় সে কিছু খাবে না।

ধীরেশ আর সীতেশ খেতে আসে। পিঁড়িতে বসে ওরা।

শোভনাকে বলে মাধুরী,—যা ভাত দিয়ে আয়।

—না তুমি যাও।—ব'লে শোভনা জড়সড় হয়ে বসে।

মাধুরী ভাত থালায় বেড়ে বলে,—তুই যা না। বসে আছে অনেকক্ষণ।

অগত্যা শোভনাকে উঠতে হয়। ভাতের থালা নিয়ে ধীরেশকে দেয়।

শোভনাকে ভাতের থালা আনতে দেখেই সীতেশ পিঁড়ি থেকে উঠে পড়ে।

ধীরেশ অবাক,—কি হোলরে। উঠলি কেন?

—আমার শরীরটা খারাপ লাগছে। আমি খাবনা।—বলে সীতেশ উঠে চলে যায় ওপরে।

শোভনা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। সব বুঝেও কিছু বলবার ভরসা পায় না।

মাধুরী শুনে বলে,—কি হোলরে?

—কি জানি বোধহয় শরীর খারাপ। তাই খেলো না।—বলে শোভনা হাসবার চেষ্টা করে।

ইচ্ছে করেই একটু দেরী করে শোভনা।

একটু বেশী রাতে খেয়ে ওপরে ওঠে। ভাবে হয়তো বা সীতেশ ঘুমিয়ে পড়বে।

ঘরে এসে দেখে সীতেশ সিগারেট টানছে। চোখদুটো জবা ফুলের মতো লাল।

শোভনা এক গেলাস জল খায়। খুব সাধারণ ভাবে শুধোয়,—জল খাবে?

আর এক গেলাস জল ভরে ওর কাছে নিয়ে যায়।

সীতেশ জলের গেলাসটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় মেঝেতে।

শোভনা অবাক হলেও কিছু বলে না। গেলাসটা কুড়িয়ে আবার ঠিক জায়গায় রেখে আলোটা নিভিয়ে দেয়।

সীতেশের সিগারেটের আগুনটা জ্বলতে থাকে।

ধীরে ধীরে এসেই সীতেশকে জড়িয়ে ধরে শোভনা,—রাগ কোর না তুমি। আমার সব কথা শোন।

—কিছু শুনতে চাই না। আমাকে ছুঁয়ো না।—বলে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় সীতেশ।

—আমি তো অন্যায় কিছু করিনি।—শোভনার গলা কাঁপে।

সীতেশ গর্জে ওঠে,—না, সব অন্যায় আমি করেছি। সব চেয়ে অন্যায় করেছি তোমার মত একটা বেশ্যাকে বিয়ে করে।

শোভনা চমকে ওঠে। কানের ভেতর যেন জ্বলতে জ্বলতে যায় কথাগুলো। সমস্ত শরীরটা ঝিঝিয়ে ওঠে যেন। বেশ্যা! এই একটি মাত্র কথা ওর মনের সুপ্ত তেজে গিয়ে ঘা দেয়।

দৃঢ় কণ্ঠে বলে,—ভুল আমারও হয়েছিল তোমার মতো এক অভদ্রকে বিয়ে করে। স্ত্রীর সম্মান রাখতে জানে না।

সীতেশের মাথার তালুটা হঠাৎ গরম হয়ে ওঠে।—চুপ কর!—বলেই গোটা কতক চড় বসিয়ে দেয় শোভনার গালে।

শোভনা বিস্ময়ের শেষ সীমায় এসে পৌঁছয়।

সীতেশ প্রায় চীৎকার করে ওঠে,—যেখানে খুশী চলে যাও। তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

শোভনা আর কথা বলতে পারে না।

গালদুটো তখনও জ্বলছে। আর জ্বলছে চোখদুটো। এক ফোঁটা জলও নেই চোখে। সীতেশ যে এত নীচে নামতে পারে এ তার স্বপ্নেরও বাইরে ছিল। অতি নীচ স্ত্রীলোকের মতো স্বামীর এই অকারণ প্রহার, অনর্থক অত্যাচার মুখ বুঁজে কি করে সইবে?

কিছুতেই নয়। সমস্ত শরীরটা কাঁপতে থাকে ওর।

বুকের ভেতরটা জ্বলে জ্বলে ওঠে।

একদিনের খেয়ালে নয়। দিনের পর দিন ধরে নিজের মনকে সংযত করে সে ভালবেসে এসেছে সীতেশকে। আজ সীতেশ টের পেয়েছে যে শোভনা বাঁধা পড়েছে কোথায়। হয়ত বা তাই এত আস্ফালন। কিন্তু সীতেশ জানে না যে শোভনার ভেতর আর একটি তেজস্বিনী ঘুমিয়ে আছে, যে জাগলে সীতেশের স্পর্ধাকে গ্রাহ্যের ভেতরই আনবে না।

সীতেশ শুয়ে পড়ে।

শোভনা একা একা জেগে বসে থাকে। কি করবে সে। এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই হবে।

রাত্রি গভীর হয় ক্রমশঃ। অন্ধকার বাড়ে।

নিষ্কম্প দীপশিখার মতো স্থির হয়ে জ্বলতে থাকে শোভনা।

জানালাটা খুলে দেয় একবার, একটু বাতাস নেই।

রাত গড়িয়ে যায় মন্থর গতিতে।

অনেক রাত হল।

চুপ করে বসেই আছে শোভনা। ওর মাথায় একটা চিন্তা এসে বাসা বেঁধেছে। তাই করবে সে।

তাই করবে। এ অপমান সয়ে সে এ বাড়িতে আর থাকতে পারবে না। কিছুতেই নয়।

প্রায় ভোর হয়ে এলো!

সীতেশও অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়ে।

শোভনা ধীরে ধীরে ওঠে।

দরজাটা খুলে বেরোয়।

সোজা গিয়ে সুধাকরের দরজায় টোকা মারে।

দুবার টোকা দিতেই সুধাকর দোরটা খুলে দেয়।

শোভনা ঘরে ঢোকে।

সুধাকর কিছুক্ষণ পায়চারি করে।

শোভনা মুখ নীচু করে বসে থাকে

সুধাকর একটা সিগারেট ধরায়। তারপর একটু হেসে বলে,—এ আমি জানতাম।

শোভনার মন শোভনার বশে নেই।

মুখ তুলে তাকায় শুধু। বেশ বোঝা যায় সে প্রকৃতিস্থ নয়।

সুধাকর বলে,—এটা ভাল হবে না। তুমি ফিরে যাও।

শোভনা মুখ নীচু করে বলে,—আমি আর ফিরতে পারব না। আজ এখুনি আপনার সঙ্গে যেতে চাই অন্য কোথাও।

সুধাকর আবার পায়চারি করে, বলে—ভাল হবে না। এটা ভাল হবে না। আমি বরং সীতেশকে বুঝিয়ে বলবো। ও ঘরে ফিরে যাও।

শোভনা যায় না। চুপ করে বসে থাকে।

একটু পরে বলে,—আর দেরী নয়। সবাই জেগে উঠবে চলুন।

সুধাকরকে বিছানাটা, সুটকেশটা গুছিয়ে নিতে হয়।

শোভনা হঠাৎ বলে,—আপনার টাকা যে রইল ও ঘরে।

সুধাকর হাসে—এমন অবস্থাতেও তোমার টাকার খেয়ালটা আছে। ওটা সীতেশ পরশু দিয়ে গেছে।

শোভনা ওঠে।

সুধাকর হাত ধরে বলে,—চলো।

শোভনার পা দুটো কাঁপে।

সুধাকর ওকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে।

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছতে ওদের বেশীক্ষণ লাগে না। ট্যাক্সিতে বসে ওরা কেউ কারো সঙ্গে কথা বলেনি। দুজনেই যেন গভীর চিন্তা সমুদ্রে ডুবে গেছে একেবারে। বাইরের জ্ঞানও নেই। শোভনা ভাবতেই পারছে না—কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কি হবে? এক সুগভীর মোহে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে যেন।

সুধাকর গম্ভীর। এত গম্ভীর সুধাকরকে কখনও দেখা যায় নি। সে জিতেছে। কিন্তু এর চেয়ে হারলেই যেন ভাল হোত। বেচারী সীতেশ! আহাম্মক!

সবচেয়ে সমস্যা তার এ জিতের যে সম্পদ তাকে রাখবে কোথায় সুধাকর? এত বড় সম্পদ রাখবার মতো স্থান নেই সুধাকরের জীবনে। তবু কিই বা করা যায়।

স্টেশনে নেমে ওরা প্লাটফর্মের এক কোণে গিয়ে বসে।

সুধাকর চুপ। শোভনাও।

একটু পরে সুধাকর বলে,—এখন কোথায় যাবে?

—যেখানকার টিকিট পাওয়া যায়। বেশী দেরী করা যাবে না।

আর একটু সময় ভাবে সুধাকর।

তারপর সুটকেশটা হাতে নিয়ে ওঠে।

বলে,—বাক্সটায় অনেক টাকা। তোমার কাছে থাকলে বিপদ হতে পারে। বিছানাটা রইল। আমি টিকিট কেটে আনছি। বোস।

বলে ভিড়ের ভেতর সোজা নেমে যায়।

শোভনা ব'সে এদিক ওদিক তাকায়। ভয় ভয় করে ওর। চারদিকে তাকায়। কেউ এসে পড়বে নাকি—ভয় হয় ওর। সীতেশ নিশ্চয় এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠে তাকে না দেখে বসে ভাবছে। ভাবছে কোথায় গেল শোভনা। তাই বা কেন ভাববে? সুধাকর নেই দেখে তো বুঝতে পারবেই যে শোভনা কার সঙ্গে গেছে। কোথায় গেছে।

জেনেই যদি থাকে, কি করবে সীতেশ?

তাকে খুঁজতে কি স্টেশনে আসবে?

যদি আসে। এসে যদি সামনে দাঁড়ায়। বুকটা ধ্বক্ করে ওঠে শোভনার। কিছু ভাবতেই পারে না। সামনে এলে কি করবে ও।

একটু পরেই কিন্তু সাহস ফিরে পায় ও।

যদি আসে, সে দাঁড়াবে বুক ফুলিয়ে। বলবে, সে আর যাবে না বাড়ি ফিরে। সীতেশ কি করবে তখন? সীতেশের মুখটা

তখন কি নীল হয়ে যাবে না? চাবুকের মতো পড়বে না কথাগুলো ওর পিঠে?

সীতেশের সেই মূর্তি ভাবতে ভাবতে ভারি আনন্দ হয় ওর।

কি আশ্চর্য! সীতেশের কথাই বা সে এত ভাবছে কেন?

সুধাকর আসছে না কেন? বেলা যে ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে।

শোভনা আতংকিত চোখে তাকায় চারদিকে। মানুষের ভিড়। কত মানুষ যাচ্ছে, আসছে। সুধাকব কই? তার তো কোন চিহ্নও দেখছে না শোভনা।

সীতেশের মুখখানা ভেসে ওঠে মনে।

সমস্ত রাত তো ঘুমোয় নি। এখন ঘুম থেকে উঠে কি করছে দেখতে পেলে বড় ভাল হোত। বড় আনন্দ পেতো ও বিষণ্ণ বিশুষ্ক মুখখানা দেখতে পেলে।

ফিরে ফিরে সীতেশের কথাটাই ওর মনে ভেসে ওঠে।

—মাইজী!

চমকে ওঠে ডাকটা শুনে।

একটা কুলি ওকে ডাকছে।

ও তাকায়।

—এঠো বাবুজী দিয়া।

বলে একটুকরো কাগজ দেয় শোভনার হাতে।

শোভনা অবাক হয়ে কাগজখানা নেয়। ভাঁজ খোলে। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা।

'দায়িত্ব নেয়া আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ। ফিরে গেলে তোমার ক্ষতি হবে না। নমস্কার।—সুধাকর।'

শোভনার হাত দুটো কাঁপতে থাকে।—বাবুজী কাঁহা?

বলে ফিরে তাকায়—দেখে কুলিটা চলে গেছে।

বুঝতে ওর আর কিছু বাকী থাকে না। সমস্ত স্টেশনটা যেন ঘুরতে থাকে।

চোখে কিছু দেখতে পায় না ও।

কিছুক্ষণ বিছানাটায় হেলান দিয়ে বসে থাকে চোখ বুঁজে। অনেকক্ষণ।

প্রায় সংজ্ঞা লোপ পায় বুঝিবা।

অনেক সময় চুপ করে শুয়ে থাকবার পর চোখ মেলে যখন তাকায়, তখন বেলা বারোটার কম নয়।

পেটের ভেতরটা মোচড়াতে থাকে।

ধীরে ধীরে ওঠে ও।

একটা পয়সাও যে সঙ্গে নেই! কি করবে ও? কোথায় যাবে?

রাস্তায় বেরিয়ে চলতে গিয়ে দেখে পা অবশ হয়ে আসে। উত্তেজনায়, হতাশায় আর এক পা চলবার ক্ষমতাও যেন নেই ওর!

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ভাববার চেষ্টা করে। কোথায় যাবে?

দাদা নেই,—ভাবতেও বুকটা আজ শূন্য হয়ে ওঠে। দাদা থাকলে আজ দাদাকে গিয়ে বলত ও, 'সুখী হবো' বলেছিলে বিয়ের সময়। দেখো আজ কত সুখী হয়েছি। নিঃসহায়, নিঃসম্বল অবস্থায় পায়ে হেঁটে এসেছি তোমার কাছে।

দাদার কথা মিথ্যে হোল!

দাদা তো মিথ্যে কখনও বলতেন না। মদ খেতেন। অন্য দোষ অনেক ছিল, কিন্তু ওই একটি গুণ তাঁর ছিল বরাবর।

শোভনার চোখদুটো জলে ভরে আসে আজ দাদার জন্যে। বেলা গড়িয়ে যায়। বিকেল হয়ে এলো প্রায়। চারদিকে তাকায় শোভনা। কোথায় যাবে?

এক বান্ধবীর কথা মনে হয়। রেবেকা দাস। ধনী কন্যা। হোস্টেলে থেকে পড়বার সময় তার বিশেষ প্রিয় বান্ধবী ছিল। ওর কাছে গেলে হয়। যদি কিছু সাহায্য পাওয়া যায়। আপাতত থাকতে পেলে একটা মাস্টারী অথবা চাকরি জুটিয়ে নেয়া যাবে।

হেঁটে যাবার সাধ্য নেই ওর।

একটা রিক্‌শা ডাকে শোভনা। রিক্‌শায় চেপে হাওড়া থেকে বৌবাজার অঞ্চলে ওর সেই বান্ধবীর বাড়ি আসে।

বাড়ির সামনে এসে ঢুকতে যেন তেমন ভরসা হয় না।

তবু মনে জোর করে ঢুকে পড়ে। বাইরের ঘরে ইজিচেয়ারে বসেছিলেন এক ভদ্রলোক। বেশ মোটা, ফরসা। বোধহয় রেবেকার দাদা।

ওকেই শুধোয় শোভনা,—রেবেকা আছে?

—রেবেকা! না, না। সে তো আজ মাস পাঁচেক হোল শ্বশুরবাড়ি গেছে। গৌহাটী।

বলে ভদ্রলোক তাকায় শোভনার দিকে,—কি দরকার বলুন তো?

শোভনা একটু থতমত খেয়ে যায়। কি যে তার দরকার, এ ভদ্রলোককে সে বলবে কি করে!

বলে তবু,—একসঙ্গে পড়তাম। একটু দরকার ছিল। আচ্ছা আসি।

বলে ভদ্রলোককে আর কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে এসে রিক্‌শায় চেপে বসে।

রিক্‌শাওয়ালা শুধোয়,—কাঁহা জায়েগী আপ্?

ভাবে শোভনা। ওর বুকটা তখনও কাঁপছে। কোথায় যাবে? কি বলবে রিক্‌শাওয়ালাকে। রিক্‌শা ভাড়াও তো তার কাছে নেই।

রিক্‌শাওয়ালার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

কোনদিকে কোন কূল-কিনারা দেখতে পায় না শোভনা।

যাবে সে সীতেশের কাছে? গিয়ে বলবে কোন একটা মিছে কথা?

না। সে কিছুতেই হতে পারে না।

একটি প্রশান্ত মুখ ওর মনে ভেসে ওঠে। এ যেন বিরাট তরংগায়িত সমুদ্রে ডুবতে ডুবতে অভয় পায়। এক জোড়া চোখ। ঠাণ্ডা। গভীর। নির্মল।

শোভনা শ্যামবাজারের দিকে যেতে বলে রিক্‌শাওয়ালাকে।

সেখানেই যাবে আজ শোভনা। একমাত্র আশ্রয় আজ তাঁর কাছেই।

শোভনা চোখ মোছে।

এক খোলার বস্তির ভেতর একটি ঘরের সামনে এসে দাঁড়াতে হয় তাকে। তখন সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে। বীরেশ দাওয়ায় একটা ঘটি নিয়ে হাত মুখ ধুতে বেরিয়ে আসে।

—কে ?

—আমি।—ক্ষীণকণ্ঠে বলে শোভনা।

এগিয়ে আসে বীরেশ,—কে, বৌমা !

মাথা নীচু করে প্রণাম করতে গিয়ে আর উঠতে পারে না শোভনা।

মনে হয় যেন সব ঘুরছে। শরীরে বল নেই।

বীরেশ বিস্মিত হয়েও বিভ্রান্ত হয় না। খুব শান্ত স্বরে শুধোয়,—কোথা থেকে এলে ? এমন অসময়ে ? সীতেশ কই ?

শোভনা চোখ তোলে। একটা কথাও বলতে পারে না।

রিক্‌শাওয়ালা হাঁকে ভাড়ার জন্যে। দেড় টাকা চেয়ে বসে।

সুবর্ণ বেরিয়ে আসে।

বীরেশ সুবর্ণকে বলে,—বৌমাকে ধরে ঘরে নিয়ে যাও।

সুবর্ণ অবাক। একি ? নিজের চোখকে যে বিশ্বাস করা যায় না !

—তুই কখন এলি ? অমন কচ্ছিস কেন ?

বলে ওকে টেনে তুলে ঘরে নিয়ে যায় সুবর্ণ।

বীরেশ রিক্‌শা ভাড়া মিটিয়ে ঘরে আসে।

দেখে শোভনা শুয়ে পড়েছে।

বীরেশ বলে,—মেয়েটার যে দুধ আছে, গরম করে বৌমাকে দাও।

সুবর্ণ বাইরে এসে তাড়াতাড়ি দুধ গরম করে নিয়ে যায়।

দুধটা খায় শোভনা। জল খায় অনেকটা।

বীরেশ কাছে আসে। সেই প্রশান্ত চোখ তুলে মিষ্টি স্বরে বলে,—কি হয়েছে বৌমা ? বলোত কি ব্যাপার ? সীতেশ ভালো আছে ?

—ভাল আছে।

—তুমি এমন ভাবে এলে ?

শোভনা মুখ নীচু করে,—আপনি চলে আসবার পর থেকেই আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত না।

বীরেশ একটু হাসে,—তাই নাকি ?

—ওঁর এক বন্ধু এসেছিলো, সুধাকর।

—হুঁ। ছেলেটিকে আমি জানি। ওর খুব বন্ধু বটে, কিন্তু ছেলেটি বড় চঞ্চল।

শোভনা কিছুতেই বলতে পারে না। তবু সব কথা না বলে আজ আর উপায় নেই।

বলতেই হবে,—বলে,—অনর্থক সন্দেহ করে কাল আমায় মেরেছে।

শোভনার চোখ হতাশা-জ্বালায় ভরা।

বীরেশ গম্ভীর হয়ে যায়। একটা কথাও আর বলে না।

বীরেশকে গম্ভীর দেখে সুবর্ণ ভয় পেয়ে যায়।

বীরেশ বলে সুবর্ণকে,—তুমি বাইরে যাও।

সুবর্ণ বাইরে চলে আসে।

শোভনার গলা বন্ধ হয়ে আসে, বলে,—লোকটিকে আমি ঘৃণাই করতাম। কিন্তু আর সহ্য করতে না পেরে লোকটির সঙ্গে আজ ভোরে বেরিয়ে এসেছিলাম।

বীরেশ ভীষণ গম্ভীর হয়ে বলে,—তারপর ছেলেটা তোমায় ফেলে চলে গেছে !

শোভনা মাথা নাড়ে। হ্যাঁ।

বীরেশ কথা বলে না অনেকক্ষণ। চুপ করে বসে থাকে।

শোভনা কাঁদে আজ। অনেক। অনেকক্ষণ।

বীরেশ সুবর্ণকে ডাকে। বলে,—আমি বাজারে যাচ্ছি। বৌমা এখানে খাবে। তাড়াতাড়ি রান্না চাপাও।

বীরেশ বাজারে চলে যায়।

সুবর্ণ রান্না চড়ায়। শোভনার কোলে মেয়েটাকে দিয়ে যায়।

শোভনা একবার শুধোয়,—খোকা কই, দিদি ?

সুবর্ণ চোখ মোছে,—খোকা নেই।

—খোকা নেই !—শোভনার বুকে আর একটা ঘা পড়ে যেন।

আর কোন কথা বলতে সাহস হয় না।

বীরেশ ফিরে এসে শোভনাকে খাওয়ায় নিজে বসে। তারপর জামাটা পরে বলে,—চলো।

শোভনা তাকায় ভয়ে ভয়ে।

বীরেশ হাসে একটু। সেই প্রশান্ত হাসি,—ভয় নেই। আমার সঙ্গে যাচ্ছ। ভয় কি ?

আবার রিক্শা করে ওরা সীতেশের কাছেই আসে। বাড়িতে এসে বীরেশ দেখে মাধুরী রান্নাঘরে বসে আছে গালে হাত দিয়ে।

বীরেশকে দেখে চমকে ওঠে,—কে, দাদা !

বীরেশ বলে, —সীতেশ কই মেজবৌমা।

—ওপরে।—বলে পেছনে দেখে শোভনা জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মাধুরী শোভনাকে দেখে চমকে ওঠে। একটা কথাও বলে না ওর সঙ্গে।

শোভনাও একটা কথা বলে না।

বীরেশের পেছন পেছন ওপরে ওঠে।

বীরেশ ওপরে উঠে সোজা সীতেশের ঘরে আসে। সীতেশ উপুড় হয়ে শুয়ে কি একটা বই পড়ছিলো।

বীরেশ এসে ওকে জামাটা ধরে সটান টেনে ওঠায়।

সীতেশ চমকে উঠে ভয়ে বিস্ময়ে কথা বলতে পারে না। দাদা ! দাদার একি মূর্তি ! চোখ দুটো রাঙা। মুখখানা গাম্ভীর্যের ভীষণতায় থম্ থম্ করছে।

—ওঠ্। তোকে আমি কি কোরব বল !

সীতেশ বোবা হয়ে যায় যেন।

দোরের সামনে দাঁড়িয়ে মাধুরী কাঁপে। ধীরেশও ঘর থেকে এসে দোরের কাছে দাঁড়ায়। শোভনা দাঁড়িয়ে থাকে স্থাণুর মতো। ওর বোধশক্তি লোপ পেয়েছে।

—তুই কি ভেবেছিস বলত ? আমাকে মারবি ? মার আমাকে !

—কি বলছ দাদা !

ফিস্ ফিস্ করে বলে বীরেশ,—সারা জীবন কি শেখালাম তোকে? তুই বৌমার গায়ে হাত তুলেছিস এ আমার শুনতে হোল। এর আগে আমায় মেরে ফেললি না কেন? গাধা!

সীতেশ শোভনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে,—কিন্তু—তুমি জাননা দাদা—ও আজ সুধাকরের সঙ্গে চলে গিয়েছিল।

—বেশ করেছিল!—বীরেশ বসে পড়ে ক্লান্ত আহত স্বরে বলে,—বিনা দোষে মেয়েটাকে তুই যা নয় তাই বলেছিস্। তোকে যে নিজের ভাই বলতেও কষ্ট হয় আজ। তুই কি বুঝবি!

—কিন্তু তুমি জাননা দাদা।—

—আমি জানি। বৌমার যোগ্য তুই হতে পারিস নি। বৌমাকে আমি তোর চেয়ে অনেক বেশী জানি।

সীতেশ তবু বলতে যায়,—তুমি জান তোমাকে ওই তো চোর বলেছিলো!

—জানি। সেও তোর দোষ! ওর কোন দোষ নেই।

—আমার দোষ!—সীতেশ হাঁ করে থাকে।

শান্তস্বরে বলে,—হ্যাঁ তোর দোষ!—ওঠে বীরেশ,—বৌমাকে রেখে গেলাম। ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে তবে আমার সঙ্গে দেখা করবি। নইলে জানবি তোর দাদা নেই।

বীরেশ দোরের দিকে তাকায়।

ধীরেশ এতক্ষণে ঘরে ঢোকে। প্রণাম করে বীরেশকে। একটা কথা বলতেও সাহস পায় না। মাধুরী এসে প্রণাম করে।

সীতেশ মুখটা নীচু করে বসে থাকে।

বীরেশ দোরের দিকে এগোয়।

শোভনা এসে দাঁড়ায় দোরের সামনে।

বীরেশ থমকে দাঁড়ায়। শোভনা মুখ নীচু করে দাঁড়ায়।

বীরেশ মৃদু স্বরে বলে,—সরো মা।

শোভনা সরে না। মুখটা তোলে। সকলেই দেখে শোভনার মুখখানা ভিজে গেছে চোখের জলে।

বীরেশ চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। বলে আবার—একটু সরতে হবে যে বৌমা।

—না।—শোভনার রুদ্ধকণ্ঠ শোনা যায়,—সরব না।

বীরেশ একটু হাসে। স্নিগ্ধ স্বরে বলে,—মুস্কিল! আমি না হয় আজ রইলাম। ওরা যে রাতে একা থাকবে। তোমার দিদি তো আবার রাতে মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠেন।

শোভনার কণ্ঠ শোনা যায় আবার,—আমি জানি দাদা। খোকা নেই। আমার দোষেই আজ খোকা নেই।

খোকা নেই! স্তব্ধ হয়ে যায় সীতেশ। ধীরেশ মাধুরী যেন নিশ্বাস নিতে পারে না।

বীরেশ আবার বলে,—সরো বৌমা!

শোভনা কাঁদে, বলে,—আপনাকে যেতে দেবো না দাদা। বীরেশ হাসে। পরম ক্ষমার হাসি,—আজ এই মুহূর্তে যা ভালো বোলে মনে হচ্ছে, কালই তা খারাপ বোলে মনে হবে। আমাকে যেতে হবেই বৌমা!

শোভনা তবু সরে না।

বীরেশ আবার বলে,—সরো মা!—আদেশের স্বর।

শোভনাকে সরতে হয়। কি জানি কেন বীরেশের আদেশ ও অমান্য করতে পারে না।

বীরেশ ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।